Anusandhanvallari
Vol 2021, No.1
January 2021
ISSN 2229-3388

Surrealistic World in the Stories of Sunil Gangapadhyay: An Intellectual Survey

Dr. Rahul Das
Department of Bengali,
Assam University

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে তারুণ্য, যৌবন এবং প্রেমের এক অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। লেখক নিজেই বলেছেন-

'পৃথিবীতে সবই হয়ত পুরনো হয়ে যায়, কিন্তু প্রেম পুরনো হয় না। প্রেম একই সঙ্গে চিরাচরিত ও আধুনিক।'[১]

তিনি সর্বদাই যৌবনের পক্ষে, মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ যুবক-যুবতীর পক্ষে। তাঁর গল্পে একদিকে যেমন আছে দেহাশ্রিত ভোগবাদী প্রেম, অন্যদিকে তেমনি প্রতিফলন ঘটেছে বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়াতীত রোমান্টিক প্রেমের। দেহকে কেন্দ্র করে শেষ পর্যন্ত দেহাতীত প্রেমে তার উত্তরণ ঘটেছে। লেখক বলেছেন, ছাত্র বয়সে তিনি যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনি প্রেম পত্রও লিখেছেন প্রায় দু'তিন হাজার। প্রেমিকাদের প্রতি চিঠি লেখার এই অভ্যাসটা পরবর্তীকালে প্রেমের গল্প লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়তা করেছিল। কল্পনা ও বাস্তবকে একত্রে অনায়াসে মিশিয়ে দেবার কৌশলটা যে প্রথম থেকেই তাঁর করায়ত্ত ছিল, এটুকু তাঁর প্রেমের গল্পগুলো পড়লেই বেশ বোঝা যায়।

প্রেমের বিচিত্র রূপ নিয়ে গল্প লেখায় কথাশিল্পী সুনীলের জুড়ি মেলা ভার। তাঁর প্রেমের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা উন্মুক্ত করে জীবনের নানা জটিলতা ও রহস্যময়তা। ভালবাসা আর দাম্পত্য প্রেমনিষ্ঠার সনাতনী আদর্শের আড়ালে কত যে বিচিত্র চোরাগলি, বাঁকের আড়ালে আছে আঁধার, কুটিলতা আর জটিলতার কত বিচিত্র রূপ,এসবই তিনি তুলে ধরেছেন গল্পের আধারে। কোনো কোনো গল্পে প্রেম এসেছে নিঃশব্দ চরণপাতে শিউলিফুলের মত, কখনো বা ভোরের মত। লেখকের 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পটির একটি প্রধান চরিত্র অনুসূয়ার জীবনেও প্রেম এসেছে নীরবে, নিঃশব্দ চরণপাতে। শিউলি ফুলের মত শান্ত, স্নিগ্ধ তার মাধুর্য। গল্পটিতে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের এক বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। গল্পটির দু'টি মুখ্য চরিত্র গায়ক অভিজিৎ সেন ও বৈষ্ণবী অনুসূয়া এই দুই বৈপরীত্যের ধারক ও বাহক।

প্রচন্ড আধুনিক মনস্ক, যুক্তিবাদী, নাস্তিক অভিজিৎ সেন বিশ্বাস করেন মানুষের জীবন তার নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন, ঈশ্বরের নয়। তার কাছে পাপ পূণ্যের বোধও সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি ভোগ বিলাসের জীবনে অভ্যস্ত। অভিজিৎ সেনের কাছে ভালবাসা কামনার অন্য নাম। শরীর সম্ভোগকে তিনি পাপ বলে মনে করেন না। জৈবিক কামনা বাসনা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, এতে কোন অন্যায় নেই। অভিজিৎ সেন বহু নারীর সাহচর্যে এসেছেন, কিন্তু কাউকেই তিনি জীবনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেননি।

বৈষ্ণবী অনুসূয়া আবার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী একটি চরিত্র। সে ঈশ্বরে বিশ্বাসী। অন্তরের বিশ্বাস ও ভক্তি দিয়ে সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করতে পেরেছে মনের গভীর গহনে। শুধু তাই নয়, পাথরের দেবতাকে সে তার স্বামীরূপে বরণ করে নিয়েছে এবং নিজেকে সেই ঈশ্বরের জীবনসঙ্গিনী রূপে ভাবতে সে অভ্যস্ত। এই ঈশ্বরেই সে নিবেদিত প্রাণ। অন্য কোন পুরুষের স্পর্শ তার কাছে পাপ ও অপরাধ।

অভিজিৎ সেন একবার মুম্বাইয়ের উদ্দাম ও ব্যস্ত জীবন থেকে কিছু দিনের জন্য দূরে সরে গিয়ে নির্জনতা উপভোগ করতে পাহাড়ে ঘেরা একটি ছোট্ট জায়গা দুরানিগঞ্জে গিয়েছিলেন। সেখানেই অনুসূয়ার সঙ্গে তার দেখা।

অভিজিৎ সেন জীবনে ফিল্ম দুনিয়ার অনেক ডাক সাইটে সুন্দরীদের সাহচর্যে এসেছেন, যাদের উগ্র রূপ ও মোহময় আবেদন যে কোন পুরুষকে মাতাল করে তুলতে পারে। অথচ দুরানিগঞ্জের নির্জন পরিবেশে অল্প বয়সী গেরুয়া বসনধারিনী বৈষ্ণবী অনুসূয়ার প্রসাধনহীন শান্ত মাধুর্য তাকে হঠাৎ চঞ্চল করে তুলে। প্রাণহীন পাথরের বিগ্রহকে অনুসূয়া স্বামী হিসেবে মেনে নিয়েছে এই সত্যটি তিনি ঠিক মানতে পারছিলেন না। পাথরের বিগ্রহের কী এতই আকর্ষণ ক্ষমতা যে অনুসূয়ার মত একটি সরল কমনীয় মেয়ে সেই আশ্রমের আরও অনেক মেয়ের সঙ্গে তাকে স্বামীরূপে ভাগ করে নিতে প্রস্তুত? হঠাৎ যেন তার পৌরুষে আঘাত লাগে।

"...আমি বাঘের মতন এক লাফ দিয়ে উঠে গিয়ে অনুসূয়ার পিঠে একটা হাত জড়িয়ে, অন্য হাতে তার থুতনিটা উঁচু করে চুমু খেলুম, নিছক এক ঠোক্করের চুমু নয়, গভীর, গাঢ় চুমু।"[২]

ব্যাপারটা অনুসূয়ার কাছে এতই আকস্মিক যে সে ঠিক মত বাধাও দিতে পারেনি। কিন্তু অন্তর থেকে নিদারুণভাবে আহত হয়েছিল। তার দু'চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু অভিজিৎ সেনের মনে কোন অনুশোচনা নেই। অনুসূয়ার কাছে এটা পাপ। তাই তার ভয় এই পাপের জন্য সে ক্ষমা করে দিলেও ঈশ্বর হয়ত অভিজিৎ সেনকে কোন বড় শাস্তি দেবেন। ঈশ্বরের শাস্তির কথা শুনে তিনি উত্তেজিত হয়ে ঈশ্বরকে যেন চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবার আকস্মিকভাবে অনুসূয়াকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত আদর এবং চুমুতে ভরিয়ে দিলেন।

অভিজিৎ সেনের কাছে ভালবাসা মানে ভোগ, দেহের উন্মাদনা ও তার চরিতার্থতা। আর অনুসূয়ার ভালবাসা শান্ত, সংযত; ত্যাগ ও বৈরাগ্যে পরিপূর্ণ।

অনুসূয়া চরিত্রের মধ্যে বিশ্বাস, ভালবাসা ও পাপ পূণ্যের একটা দোলাচলতা লক্ষ্য করা যায়। সে ঈশ্বরের পায়ে নিবেদিত প্রাণ। তাই অন্য কোন পুরুষকে ভালবাসতে নেই, এতে পাপ হয় বলেই তার বিশ্বাস। অথচ অভিজিৎ সেনের উষ্ণ আলিঙ্গনে তার দেহ সাড়া দিয়েছিল, যদিও মনকে সে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল। অন্ধ সংস্কারের বশবর্তী হয়ে সে অভিজিৎ সেনের ভালবাসাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আবার প্রতিনিয়ত তার অমঙ্গলের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত থেকেছে, মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা করেছে। অনুসূয়া নিজের আয়ু দিয়েও তাকে ভাল রাখতে চায়। প্রেমাস্পদের মঙ্গলের জন্যই সে নিজেকে তার থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। ভালবাসার এর থেকে বড় উদাহরণ আর কী-ই বা হতে পারে?

অন্তরে ভালবাসা সত্ত্বেও সেই মানুষটির মঙ্গলের জন্য অনুসূয়া তার দেওয়া বিবাহের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে দূরে সরে যায়। কারণ সে বিশ্বাস করে তাকে গ্রহণ করলে ঈশ্বরের প্রতিশোধ বর্ষিত হবে সেই মানুষটির উপর।

ভোগবাদী অভিজিৎ সেনও অনুসূয়াকে অন্তর দিয়ে ভালবেসে ফেলেছিলেন, তাই শেষ মুহূর্তে তার বিশ্বাসে আঘাত দিয়ে জোর করে কাছে না টেনে দূরে সরে এসেছিলেন।

ভোগ ও ত্যাগের ভালবাসার সমন্বয়ে গঠিত এক হৃদয়গ্রাহী মনস্তাত্ত্বিক প্রেমের গল্প হয়ে উঠেছে 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' গল্পটি।

লেখকের নিজের জীবনেও প্রেমের প্রতি প্রবল ও দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বহু নারীর সংস্পর্শে আসেন এবং অনেকের প্রতিই তাঁর একটা বিশেষ আকর্ষণও তৈরি হয়েছিল।

সুনীল সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাঁর জীবনসঙ্গিনী স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন-

"সুনীল ছিল রমণীমোহন। মেয়েদের কাছে ভারী প্রিয়, একথা সবাই জানে। মেয়েরা ওর জীবনে এসেছে। আমি ছাড়াও অন্য নারীর প্রতি সে অনুরক্ত হয়েছে, তা আমি জানি।"[৩]

লেখক সৃষ্ট অভিজিৎ সেন চরিত্রের মধ্যে লেখকের ব্যক্তি চরিত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য ও চিন্তা চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। লেখক সুনীল নিজেও ছিলেন খুব নাস্তিক; অথচ প্রবলভাবে রোমান্টিক ও আধুনিক মনস্ক। নারী পুরুষের জৈবিক চাহিদাকে তিনি আর পাঁচটা সাধারণ চাহিদার মতোই মনে করতেন। তাই বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক মিলনকেও তিনি পাপ বলে মনে করতেন না। তাই মনের আকর্ষণ ও দেহের আকর্ষণ দুটোকেই তিনি তাঁর গল্পে সমানভাবে স্থান দিয়েছেন। প্রেমের নানা বিচিত্র অভিব্যক্তি অন্বেষণ ও সম্পর্কের নানা জটিলতা ব্যঞ্জিত হয়েছে বহু গল্পে।

'মহাপৃথিবী' গল্পটি সমাজের অন্তেবাসীদের নিয়ে লেখা, কিন্তু রচনার গুণে জীবন রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর এক মাছ বিক্রেতা সুবলের পরিবারের প্রাত্যহিক দিন যাপনের এক টুকরো ছবি দিয়ে গল্পটি তৈরি হয়েছে। সাত সন্তান স্ত্রী ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে সুবলের সংসার। অভাব অনটনের সংসারে দু'বেলা পেট ভরে দু'মুঠো খেতে পায় না সবাই। কিন্তু এ নিয়ে তাদের তেমন কোন অভিযোগ নেই। এদের প্রত্যাশা কম, তাই অভাব অনটন এবং শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দুঃখ এদেরকে তেমনভাবে স্পর্শ করতে পারে না। সাত সন্তানের মধ্যে একমাত্র হারান ছাড়া কেউ স্কুলের মুখ দেখেনি। তবুও তাদের শৈশব এবং কৈশোর কাটছে নিজেদের ছন্দে। দেশের উন্নয়নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাস্তা ঘাট প্রসারিত হচ্ছে, নতুন রাস্তার পাশের ডোবা জমিগুলোর দাম বাড়ছে, সেইসঙ্গে বাড়ছে সুবলের বসত ভিটের দামও। সেই স্বপ্নেই বিভোর সুবল। পরিবারের নিত্য নৈমিত্তিক অভাব অনটন নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।

সুবলের মেয়ে কুসীর বয়স প্রায় ষোল। বাড়ন্ত শরীর, কিন্তু পেট ভরে খেতে পায় না। বাড়িতে সর্বক্ষণ তাকে লাথি ঝাঁটা খেতে হয়, কারণে অকারণে দুম করে পিঠে কিল পড়ে। সংসারে সে উপেক্ষিত হয়তবা মেয়ে বলেই। কিন্তু এই উপেক্ষিত ও অবহেলিত কুসীর গুপ্ত প্রণয়ের ছবি গল্পটিকে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। প্রেমের উষ্ণতার কাছে কোন শ্রেণি পার্থক্য নেই। প্রেমের সেই উষ্ণতা ও মাদকতা তাই কুসীর শরীরেও শিহরণ তুলে, সে পুলকিত হয়।

একদিন ভর সন্ধ্যেবেলা প্রেমিকের ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের অজান্তেই প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণে কুসী চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে একটা ঝোপের আড়ালে চলে আসে। টাবুদা তাকে ভালবাসে, আদর করে। তার জন্য এটা ওটা খাবারও নিয়ে আসে। বাড়িতে সে সর্বক্ষণ লাথি ঝাঁটা খায়, পেট ভরে খেতেও পায় না। একমাত্র টাবুদা ছাড়া কেউ তাকে ভালবাসে না। টাবুদার ভালবাসা ও শারীরিক সান্নিধ্য এক দরিদ্র পরিবারের অবহেলিত কিশোরী কুসীকে প্রেমময়ী করে তুলেছে। এ গল্পে যৌনতার এক বিশেষ ভূমিকা আছে, গল্পকে সজীব করে তোলার জন্য।

"বাড়ির পেছন দিক দিয়ে ঘুরে কুসী চুপি চুপি ভি.আই. পি রোডে চলে এলো। সাট্ সাট্ ক'রে গাড়ি যাচ্ছে, কুসী চট্ ক'রে রাস্তা পার হয়ে চ'লে গেলো ও পাশে, তারপর রাস্তার ধার দিয়ে নেমে ঢালু জায়গাটা পেরিয়ে জলের পাড় ঘেঁষে একটা আস শ্যাওড়া ঝোপের পাশে চ'লে এলো। সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলে তার শক্ত জোয়ান হাতে কুসীকে তার কোলে টেনে নিলো।"[৪]

গল্পটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে সুবলের জমিতে টাঙানো বিমান কোম্পানির বিজ্ঞাপন।

"পুরো ছবিটাই সুন্দর মাদক নীল রঙের, ডানদিকের কোণে একটা উড়ন্ত বিমান, বাঁদিকে দূর শহরের দৃশ্য, মন্দিরের মতন বাড়ির চূড়া, মনে হয় দেবভূমি অমরাবতীর ছবি যেন, নিচে হাত ধরাধরি ক'রে ছুটছে সাহেব মেম যুবক যুবতী, মেমটির স্কার্ট উড়ে গেছে অনেকখানি, কী সুন্দর তার পা দুখানি, তার বুকের ডৌল ও বড়ো মনোরম।"[৫]

প্রেমিকের উষ্ণ আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে শরীরময় অনির্বচনীয় পুলক নিয়েও কুসী বারবার অন্ধকারে হঠাৎ ঝলসে ওঠা ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকে। বদ্ধ এঁদো ডোবার অন্ধকারে অবহেলিত এক কিশোরীর জীবনের ছবির সঙ্গে মুক্ত উষ্ণ মনোরম আত্মবিকাশের সম্ভাবনাময় আধুনিক জীবনের ছবি মিলিয়ে 'মহাপৃথিবী' গল্পটি রচিত হয়েছে। এই দুই জীবনের মধ্যে বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হলেও কোন এক মায়াবী মুহূর্তে এই দুই ছবি যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বিজ্ঞাপনের যুবক যুবতী ও কুসী আর তার টাবুদা এরা সবাই যৌবনের পথিক। উড়ন্ত বিমান ও ছুটন্ত যুবক যুবতীর মোহময় আবেদনে ধরা দিয়েছে মহাপৃথিবী। সেইসঙ্গে অর্ধনগ্ন কুসী, প্রেমিকের ভালবাসা ও আদরে শরীরময় এক অনির্বচনীয় পুলক নিয়ে খুঁজে পেয়েছে এক অন্য জীবন, প্রেমিকের বাহুপাশে কুসীর কাছে ধরা দিয়েছে এক অন্য পৃথিবী।

বিষয় ও বিন্যাস গুণে গল্পটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভালবাসা নামক এক মন কেমন করা অনুভূতির আলো কীভাবে আমাদের জীবনকে বদলে দেয়, কেমন করে আমাদের দিন রাত্রির মূল্য বাড়িয়ে দেয়, জীবনের দিগন্তকে প্রসারিত করে দেয়, তারই এক নিপুণ শিল্প রূপ গল্পটি। জীবনের নানা টানা পোড়েন এবং ঘূর্ণাবর্তের মধ্যেও বয়ে চলে প্রেমের মন্দাকিনী; বারবার জীবনের নানা স্তরে নানা বিরোধাভাসের মধ্যেও তা ধরা পড়ে।

'সেই গাছটির নীচে' গল্পটি আবার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী এক রোমান্টিক ভালবাসার গল্প। ভোগ নয়, ত্যাগ নয় আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে স্মৃতির দর্পণে ভালবাসাকে উপলব্ধি করার এক বিচিত্র প্রয়াস। গল্পটি উত্তম পুরুষের জবানীতে লেখা।

একদিন গল্পকথক এক মেঘলা দুপুরে অপরূপ রূপসী শকুন্তলাকে হঠাৎ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবেগের আতিশয্যে চলন্ত বাস থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন। ফলে হাঁটুতে একটু চোটও লাগে। কিন্তু সেই স্বপ্নসুন্দরীর সান্নিধ্য তাঁকে সব ভুলিয়ে দেয়। শকুন্তলার গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ওরা দু'জন রেড রোড থেকে পার্ক স্ট্রিটের দিকে হাঁটতে শুরু করেন। কিছু দূর এগোনোর পর হঠাৎ জল প্রপাতের মত প্রচন্ড বেগে বৃষ্টি নামলো, সেই সঙ্গে বজ্রগর্জন। দু'জনে এক কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে আশ্রয় নিলেন।

সেই বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় কুয়াশার মত বৃষ্টির চাদরে ঢেকে মানস প্রতিমার যে নিবিড় সান্নিধ্য ও স্পর্শ তিনি অনুভব করেছিলেন, সেটাই তাঁর কাছে ভালবাসার এক গোপন মধুর স্মৃতি হয়ে জেগে রইলো। কৃষ্ণচূড়া গাছটি ছিল সেই চরম মুহূর্তের সাক্ষী। শকুন্তলা এসব কিছুই জানতো না। কিছুদিন পর সে বিদেশে চলে যায়। যাবার আগে যে পার্টি দিয়েছিল, তাতে কথকও নিমন্ত্রিত ছিলেন। কথকের প্রতি শকুন্তলার সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনে সঙ্গ দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তিনিও এর থেকে বেশি কিছু প্রত্যাশা করেননি। তাঁর গোপন অনুভূতিটুকু নিজের মধ্যেই সীমায়িত ছিল। তবে মাঝে মাঝেই রেড রোড থেকে পার্ক স্ট্রিট যাওয়ার পথে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটির নীচে দাঁড়াতেন। শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর সেই নিবিড় সান্নিধ্যটুকু অনুভব করার জন্য। শকুন্তলা স্বয়মাগতা হয়ে এক মুহূর্তের জন্য তাঁর জীবনে এসেছিল এবং নিজের অজান্তেই সে কথককে অনেকখানি দিয়ে গেছে। এই স্মৃতিটুকুই গল্প কথকের কাছে তাঁর ভালবাসার সার্থকতা রূপে ধরা দিয়েছিল।

একদিন হঠাৎ সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার পথে তিনি আবিষ্কার করলেন কৃষ্ণচূড়া গাছটি আর নেই, কেউ একেবারে গোড়া থেকে গাছটিকে কেটে ফেলেছে। এই দৃশ্যটি কথককে নিদারুণ আঘাত দিল। সশরীরে শকুন্তলার বিচ্ছেদ বেদনা তাঁকে ততটা আঘাত দেয়নি, যতটা আঘাত তিনি পেয়েছিলেন সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায়। বাস্তবে শকুন্তলাকে পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, সেটা তিনি জানতেন। তাই সেই অলীক কল্পনাও তিনি করেননি। কিন্তু তাঁর মনের গভীর গোপনে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের স্মৃতি বিজড়িত ঘনিষ্ট মুহূর্তটিকে তিনি অনুভব করতেন, সেই গাছটির নীচে দাঁড়িয়ে। এটাই ছিল তাঁর কাছে পরম প্রাপ্তি, তাঁর ভালবাসার সার্থকতা।

কৃষ্ণচূড়া গাছটিই এতদিন শকুন্তলাকে তাঁর জীবনে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাই সেই গাছটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলার সঙ্গে চির বিচ্ছেদের বেদনায় লেখকের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। সত্যিই ভালবাসার কী বিচিত্র রূপ।

এই গল্পটির মাধ্যমে লেখক চিরাচরিত প্রেমের ধারাবাহিক গন্ডীর বাইরে ভালবাসার অন্য এক রূপ পাঠকদের উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং বিনির্মাণ করেছেন প্রেমের এক নিজস্ব জগতকে। তাঁর প্রেমের গল্পগুলি পড়তে পড়তে মনেহয় লেখকের অন্তরে লুকিয়ে থাকা প্রেমিক সত্তাটি তাঁকে চির নবীন করে রেখেছে। তিনি চিরদিনই ছিলেন যৌবনের পথিক। তাই তো প্রেমের সাতরঙ তাঁর গল্পে বিচিত্র অনুভূতির ইন্দ্রজাল রচনা করে পাঠকমনে বৈচিত্র্যের অনুভূতি জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

'নারী' গল্পটিতে ভালবাসার এক অন্তর্ঘাতী দ্বান্দ্বিক রূপ পরিলক্ষিত হয়, বনেদী বাড়ির মেয়ে সুজাতা ও সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে অনীশ রায়ের মধ্যে গড়ে ওঠা ভালবাসার মধ্য দিয়ে। কোন এক বৃষ্টিভেজা পড়ন্ত বিকেলে এই প্রেমিকযুগল কলেজ স্ট্রিটের একটি কফি হাউসে বসে গল্প করছিল। হঠাৎ-ই কোন অজ্ঞাত কারণে অভিমানাহত সুজাতার নীরব প্রস্থান দিয়ে গল্পটির শুরু।

অনীশের বন্ধুরা ঠিক করেছিল, ওরা সবাই মিলে উটিতে বেড়াতে যাবে। কিন্তু সুজাতার তাতে আপত্তি। সে চায়, অনীশ তাকে নিয়ে পুরী বেড়াতে যাবে। প্রস্তাবটা শুনে অনীশ প্রথমে একটু চমকে উঠেছিল। আর্থিক অস্বচ্ছলতা, সেই সঙ্গে মধ্যবিত্তের রক্ষণশীল মানসিকতায় বিয়ের আগে বান্ধবীকে নিয়ে সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যাওয়া ও একসঙ্গে হোটেলে বসবাস প্রথাগত সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে। তবুও সুজাতাকে খুশী করার জন্য সে রাজি হয়ে যায়। কিছুক্ষণ দুজন নীরবে বসেছিল। হঠাৎই সুজাতা উঠে একা জল কাদার মধ্যে বেরিয়ে পড়লো। অনীশ আটকাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় তাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল। অনীশ বুঝতেই পারেনি কী তার অপরাধ। সুজাতার এই নীরব প্রত্যাখ্যান অনীশকে অভিমানাহত করে তুলেছিল, সেই সঙ্গে সুজাতার প্রতি অবজ্ঞাও। সেই থেকে দু'জনের জীবন দুই ভিন্ন ধারায় বইতে থাকে।

সময়ের ঘূর্ণাবর্তে বহু বছর পর আবার এক রেস্তোরাঁয় দু'জনের দেখা। অনীশ তখন এক সফল ডেপুটি পারচেজ অফিসার তথা সমাজের এক বিত্তবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব। স্ত্রী সন্তান নিয়ে সুখের সংসার। দু'জনেই কেউ কারো প্রতি বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি, শুধুমাত্র কুশল বিনিময় ছাড়া। কিন্তু এর আগেই হঠাৎ একদিন সুজাতা তার অবচেতন মনে নিজের স্থান করে নিয়েছিল। সুজাতার শরীরের প্রতি সে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে। স্ত্রীর ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে সে সুজাতাকে কামনা করে। স্ত্রীর সঙ্গসুখ অনীশ রায়কে আর তৃপ্ত করতে পারে না। মনের গহনে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত ভালবাসা হঠাৎ কামনার আগুনে দীপ্ত হয়ে ওঠে। আর এই অতৃপ্ত ভালবাসাকে শান্ত করতে অনীশ একাধিক নারীর সংসর্গে এসেছে, কিন্তু কেউই তাকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। বারবার সে শুধুই সুজাতার সঙ্গসুখ কামনা করেছে। অনীশের মনে হত সুজাতার শরীর এদের সবার থেকে আলাদা, সুজাতার সান্নিধ্য তাকে উষ্ণতার শিখরে পৌঁছে দেবে।

শেষ পর্যন্ত একদিন বদ্ধ ঘরে সুজাতাকে কাছে পেয়ে তার এতদিনের অতৃপ্তিকে সুজাতার সম্মতিতেই চরিতার্থ করার সুযোগ পেয়েও অনীশ নিজেকে সংযত করে নেয়। যদি কল্পনার সেই সঙ্গ সুখ সুজাতা তাকে দিতে না পারে? তার চেয়ে বরং সুজাতা সারা জীবনের জন্য তার কাছে স্বপ্নের নারী হয়েই বেঁচে থাকুক। তাছাড়া সুজাতার সম্মতিতে তার এত কাছাকাছি এসেও সুজাতাকে এভাবে প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে অনীশ একটা জয়ের অনুভূতি উপভোগ করে। এতদিন সুজাতার বিচ্ছেদে অনীশের মনে যে অতৃপ্তি জেগে উঠেছিল, আজ অনীশের এভাবে প্রত্যাখ্যানের পর সুজাতাকেও হয়ত সেই একই অতৃপ্তি কুরে কুরে খাবে।

সুজাতা ও অনীশ একে অপরকে ভালবেসেছিল।একে অপরের জন্য বিরহ ব্যথায় কাতরও হয়েছে। কিন্তু তাদের জীবনে ভালবাসার থেকে অহংবোধ বড় হয়ে উঠেছিল। তাই অন্তরে ভালবাসা সত্ত্বেও তারা একে অপরকে আঘাত দিয়ে তাদের অহংবোধকে চরিতার্থ করেছে। এটি একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক প্রেমের গল্প হয়ে উঠেছে।

লেখকের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় নারীর যে বহুমুখী মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ধরা দিয়েছে, সেই জটিল মনস্তাত্ত্বিক ও দ্বান্দ্বিক পরিসরে দাঁড়িয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন এমন কিছু নারী চরিত্র, যারা বিষয় বৈচিত্র্য ও সৃজন কৌশলের গুণে বাস্তবের জমি স্পর্শ করেছে। কিশোর বয়স থেকেই লেখক বহু প্রেম পত্র লিখেছেন, তাঁর সেই প্রেমিকাদের স্বতন্ত্র্য চরিত্র বৈশিষ্ট্য লেখককে নারী মনস্তত্ত্বসম্পর্কে কিছু বিশেষ ধারণার সন্ধান দিয়েছে। নারী চরিত্র নিয়ে কৌতূহলী লেখক জীবনের বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটে দেশ বিদেশের অনেক মোহময়ী রমণীর সংস্পর্শে আসেন। প্রেমের এই একান্ত ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা তাঁর প্রেমের গল্পগুলিকে একদিকে যেমন জীবন্ত করে তুলেছে, অন্যদিকে তেমনি বৈচিত্র্যময়ও করে তুলেছে। নারী মনস্তত্ত্বও প্রেমের বহু বিচিত্র জটিল দিক দুই-ই তাঁর গল্পে খুব স্পষ্ট ভাবে ধরা দিয়েছে এবং নির্মাণ করেছেন সুজাতার মত বহু বিচিত্র নারী চরিত্র।

লেখকের 'দুজন' গল্পটি একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। হয়তবা লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের কোন এক বিশেষ পর্যায়ে আগত কোন বিশেষ নারীকে কেন্দ্র করে, কল্পনার রঙ্ মিশিয়ে তৈরী হয়েছে এই বিয়োগান্ত প্রেমের গল্পটি। গল্পটির নাম 'দুজন' হলেও মূলত তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে গল্পটি গড়ে উঠেছে। লেখক সুনীল, ইউনিক টিউটোরিয়ালের অঙ্কের শিক্ষক তাপস হালদার ও তার ছাত্রী বন্যাকে কেন্দ্র করে গল্পটি এগিয়ে গেছে।

প্রেমের দুরন্ত আকর্ষণ কোন যুক্তি তর্ক বা বাধা নিষেধের ধার ধারে না। বন্যার প্রতি দুর্বার আকর্ষণতীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব তাপস হালদারকে কীভাবে বিভ্রান্ত ও মতিভ্রষ্ট করে তুলেছিল তারই এক সজীব প্রতিলিপি এই গল্পটি।

বন্যার প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ তাপস হালদারকে উন্মাদ করে তুলেছিল। এই উন্মাদনার বশে সদা ব্যস্ত তাপস হালদার বন্যাকে পড়ানোর ছলে হ্যাংলার মত প্রায়ই বন্যার বাড়িতে এসে উপস্থিত হতেন। গল্প কথক ও তার প্রেমিকা বন্যার মাঝখানে ঢুকে জোর করে তার উপর কতৃত্ব খাটাতেন। গল্পে উল্লেখিত লেখক ও বন্যার মেলামেশা তাপস হালদার একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। কখনো রাগে অন্ধ হয়ে ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে বন্যার প্রেমিককে গালাগাল ও দিয়েছেন। বন্যার প্রেমে পাগল তাপস হালদার হঠাৎ একদিন নিজের স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে বসেন। শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য তাপস হালদার বন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসেন। এতে তাপস হালদারের সম্মান ও ভাবমূর্তি দুটোই সবার কাছে নষ্ট হয়ে যায়।

উচ্চ শিক্ষার জন্য বন্যার বিদেশ যাত্রা প্রতিহত করতে না পেরে তিনি নিজেও বিদেশে পাড়ি দেওয়ার প্রস্তুতি নেন। কিন্তু এত উত্তেজনা ও প্রেমের ব্যর্থতা তিনি সহজভাবে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সেরিব্রাল অ্যাটাক হল। মাস চারেক পর সুস্থ হয়ে উঠে তিনি নিজেকে সংযত করে নিলেন। দ্বিতীয়বার বিয়েও করলেন। কিন্তু মন থেকে বন্যাকে মুছে ফেলতে পারেননি। বিদেশে অধ্যয়নকালে একদিন সুইমিংপুলে সাঁতার শিখতে গিয়ে জলে ডুবে বন্যার মৃত্যু হয়। বন্যার এই আকস্মিক মৃত্যু তার প্রেমিক এবং ব্যর্থ প্রেমিক দুজনকেই দারুণ আঘাত দিয়েছিল।

বন্যার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের প্রায় ঊনিশ বছর পর লেখক যখন একদিন বন্যার এক বহু পুরোনো চিঠি নিয়ে সফল নাট্যকার তাপস হালদারের বাড়িতে উপস্থিত হন, সেদিনও বন্যার প্রসঙ্গ তাপস হালদারকে ভেতরে ভেতরে চঞ্চল করে তুলে। সুদীর্ঘ বছরের ব্যবধানেও তিনি বন্যাকে ভুলতে পারেননি। বাইরে থেকে নিজেকে সংযত করে নিলেও অন্তরে বন্যার প্রতি ছিল অগাধ ভালবাসা, যদিও বন্যা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। বন্যার অকাল মৃত্যুর জন্যও তিনি

কিছুটা হলেও নিজেকে দায়ী ভাবতেন। সুদীর্ঘ ঊনিশ বছর পর বন্যা যখন প্রায় সবার কাছেই বিস্মৃতির অতলে বিলীন হয়ে গিয়েছিল, তখনও সে দুই প্রেমিকের স্মৃতির দর্পণে জ্বাজল্যমান ছিল।

তাপস হালদারকে বন্যা প্রেমিক হিসেবে মেনে নিতে পারেনি, শিক্ষক হিসেবে তার প্রতি ছিল কৃতজ্ঞতাবোধ। কিন্তু লেখকের সঙ্গে বন্যার ছিল মিষ্টি মধুর প্রেমের সম্পর্ক। প্রেমিকের অনুমতিক্রমেই সে বিদেশে পাড়ি দিয়েছিল। তবে যাবার আগে ঘাটশিলায় গিয়ে সাঁতার শেখার পরিকল্পনা ছিল তার, কিন্তু সে সুযোগ আর হয়নি। তাই লেখক নিজেও বন্যার মৃত্যুর জন্য খুবই অনুতপ্ত ছিলেন।

গল্পের শুরুতে কথক এবং তাপস হালদারের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে থাকলেও সমাপ্তিতে এসে এই দুই প্রেমিক মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছেন। দুই প্রেমিকের মনে বন্যার প্রতি ভালবাসা ও তার মৃত্যুর আঘাত জনিত ব্যথার অনুভূতির মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। বন্যাকে সবাই ভুলে গেলেও সে চিরদিন বেঁচে থাকবে এই প্রেমিক যুগলের ভালবাসার অনুভূতি ও বেদনার মধ্যে। প্রেমের এমনই অপরাজেয় শক্তি, যা মৃত্যুকেও হার মানায়।

এই গল্পটিতে লেখক স্বনামে এবং নিজ পেশায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার আগে লেখকের জীবনে কর্ম এবং উপার্জনের জন্য যে সংগ্রাম ছিল, সেই সঙ্গে গৃহ শিক্ষকতাই যে সে সময় উপার্জনের প্রধান মাধ্যম ছিল, এই গল্পটির মুখ্য চরিত্র লেখক সুনীলের মধ্য দিয়ে তা রূপায়িত হয়েছে। কথা সাহিত্যিক সুনীল ব্যক্তি জীবনেও গৃহ শিক্ষকতা উপলক্ষে অনেক তরুণীর মনের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন। এদের প্রত্যেককে ঘিরেই কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল লেখকের মনে। কোন গল্পে বাস্তবের ভূমিকা আংশিক, আবার কোন গল্পে অনেকটাই। কেননা অনুভূতি ছাড়া প্রেমের গল্প ঠিক দাঁড়ায় না। লেখকের ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনুভূতি ও কল্পনার সংমিশ্রনে তিনি রচনা করে গেছেন অজস্র প্রেমের গল্প। আর সেজন্যই তিনি যৌবনের পথিক হিসেবে পাঠক মহলে পরিচিতি লাভ করেছেন।

ভালবাসাকে নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞায় সীমায়িত করা যায় না। ব্যক্তি বিশেষে ভালবাসার রূপ, রং ও অনুভূতির পরিবর্তন ঘটে। কারো কাছে প্রেম ত্যাগ ও পূজাতে পরিপূর্ণতা পায়। আবার কারো কাছে ভোগ ও প্রাপ্তিতেই প্রেমের সার্থকতা। কখনো কখনো প্রেমিকের শূন্যতাকে পূর্ণ করতে তারই কোন প্রিয়জনের মধ্যে প্রেমিকা খুঁজে বেড়ায় তার হারিয়ে যাওয়া প্রিয়তমকে। 'ত্রয়ী' গল্পটির রুমাও তেমনি তার হারিয়ে যাওয়া প্রেমাস্পদ মানসকে খুঁজে পেতে চেয়েছিল মানসেরই একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু অনুপমের মধ্যে। রুমা ও মানস একে অপরকে খুবই ভালবাসতো। দু'জনের বিয়েও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের ঠিক সতেরো দিন আগে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় মানস চিরদিনের মত হারিয়ে গেল রুমার জীবন থেকে। দুর্ঘটনার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বন্ধু অনুপমের কোলে মাথা রেখে মানস শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো। আর সেই সঙ্গে রুমার জীবনে নেমে এল ঘন অমানিশা। প্রেমিকের বিরহে বিরহিনী রুমা তার স্মৃতি আঁকড়ে ধরে বেঁচে রইল নিজের জগতে, কোন জীবনসঙ্গী ছাড়াই। একটা চাকরিও পেয়ে গেল সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের পে অ্যান্ড অ্যাকাউন্টসে।

বহু বছর পর রুমা যখন প্রায় যৌবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে তখন হঠাৎ একদিন কলকাতার ট্রাফিকে অনুপমের সঙ্গে রুমার দেখা হয়ে যায়। অনুপম তাকে চিনতে না পারলেও রুমা ঠিকই চিনেছিল। তাই ইঙ্গিতে কাছে আসতে বলে। রুমার পরিচয় জানার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে থাকা অপরিচয়ের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে এক নিবিড় আন্তরিকতার সেতু তৈরি হল, যে সেতুর যোগ সূত্র রক্ষাকারী স্বয়ং মানস। মানসের প্রতি তীব্র ভালবাসা বুকে নিয়ে, তার স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে এই সদ্য পরিচিত মানব মানবী একে অপরের আপন জন হয়ে উঠল। তাই রুমা বিনা দ্বিধায় প্রায় অপরিচিত এক পুরুষ অনুপমকে নিজের ফ্ল্যাটে আহ্বান জানায়। আর অনুপমও নির্দ্বিধায় তার সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে যোধপুর পার্কে রুমার ফ্ল্যাটে চলে আসে। মানস নামের এক তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিত অস্তিত্ব দুই অপরিচিতকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে এল। মানসের মৃত্যুর মুহূর্তে একমাত্র অনুপম ছাড়া আর কেউ ছিল না

তার সঙ্গে। মানস ও অনুপমের মধ্যে এক অতলস্পর্শী বন্ধুত্ব ছিল, একে অপরের জন্য যেন উৎসর্গীকৃত প্রাণ। রুমা সেটা জানতো। তাই বহু বছর পর হঠাৎ দেখা হওয়া অনুপমের মধ্যে সে খুঁজে পেতে চেয়েছিল মানসকে। মনের মানুষকে হারিয়ে এতদিন নিঃসঙ্গতায় ক্ষত বিক্ষত ছিল তার মন। অনুপমকে স্পর্শ করে সে অনুভব করতে চেষ্টা করেছিল মানসের স্পর্শ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অনুপম তার ভীষণ আপন জন হয়ে উঠলো। কারণ রুমা ও অনুপম দুজনেই মানসকে খুব ভালবাসতো। মানসের জন্য এদের দু'জনেরই জীবনের গতি বদলে গেছে। সেদিন অনুপমের চলে যাওয়ার মুহূর্তে তাই রুমা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। স্মৃতির আয়নায় পুরোনো সেই দিনের ছবি তাকে আকুল করে তুলে। দু'চোখ বেয়ে ঝরতে থাকে শ্রাবণের ধারা। অনুপম তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পিঠে হাত রাখতেই বাঁধনহীন প্রেমের জোয়ারে রুমা পরম নির্ভরতায় অনুপমের বুকে আশ্রয় খুঁজলো। আসলে রুমা অনুপমের মধ্যে মানসের প্রতিচ্ছবি অনুভব করতে পেরেছিল। মানস চলে যাওয়ার পর সেই দুঃখকে বুকে চেপে রেখে রুমা নিজেকে সংযত রেখে অনেকগুলো বছর অতিক্রম করে এসেছে। অন্য কোন পুরুষের প্রতি কোনদিন তার কোন আকর্ষণ তৈরি হয়নি। দাম্পত্য জীবনের প্রতিও তার কোন আগ্রহ ছিল না। তাই অনুপমকে চলে যেতে দেখে রুমার অশ্রুবিসর্জন আসলে অনুপমের প্রতি ভালবাসা নয়, মানসের প্রতি গভীর প্রেমের অভিব্যক্তির বহিঃপ্রকাশ মাত্র। রুমা তার হারিয়ে যাওয়া প্রেমিক মানসকে খুঁজে পেয়েছিল, তারই প্রাণের দোসর অনুপমের মধ্যে। কিন্তু অনুপম বন্ধুর দয়িতাকে কাছে টেনে নিয়ে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়নি। তাই সে যখন বলে, সে কিছুতেই মানসের জায়গা নিতে পারবে না, রুমা তখন দুঃখী গলায় বলেছিল-

'তুমি ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই!'[৬]

রুমার এই উক্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে মানসের প্রতি গভীর ভালবাসা। এই গল্পটির মাধ্যমে লেখক প্রেমের মাধুর্য ও অন্তর্ভেদী রহস্য কলমের সূক্ষ্ম আঁচড়ে শিল্পিত করে তুলেছেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন গল্পে ভালবাসার বহু বিচিত্র অনুভূতি ও মনস্তাত্ত্বিক দিক উন্মোচিত করেছেন। কারও কাছে ভালবাসা চাওয়া পাওয়ার নির্দিষ্ট গন্ডীতে সীমাবদ্ধ, ভোগ বিলাসেই এর চরিতার্থতা আবার কারও কাছে প্রেম পূজারই নামান্তর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা।'

প্রেমের রূপশিল্পী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ব্যর্থ প্রেমিক' গল্পে আমরা দেখি, প্রেমিকের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদা যাতে কোন অবস্থাতেই কারো কাছে ম্লান হয়ে না যায় সেই জন্য প্রেমিকা অনিতা তার প্রেমের বলিদান দিয়েছে। প্রেমিক মনিময়ের প্রতি নিবেদিত প্রাণ অনিতা অন্তরে এক বুক ভালবাসা ও বিরহ বেদনা নিয়ে মনিময়ের জীবন থেকে হঠাৎ একদিন হারিয়ে যায়। অনিতার সামাজিক পরিচয় ছিল কালিমাময়। অনিতা যখন খুব ছোট তখন একদিন তার মা কুল ত্যাগ করে। অনিতার বাবাও একজন নার্সকে রক্ষিতা করে ঘরে নিয়ে আসেন। এই রকম একটি কলুষিত পরিবারের মেয়ে হিসেবে সে নিজেকেও কলুষিত ভাবে। অনিতা যেদিন মনিময়ের বাড়িতে বেড়াতে যায়, মনিময়ের পরিবারের সদস্যদের আন্তরিকতা ও সরলতা তাকে মুগ্ধ করে। নিজের পরিচয় গোপন করে সে কিছুতেই তাদের ঠকাতে চায়নি। মনিময়কে তার মা, ভাই বোন সবাই খুব ভালবাসে। অনিতা যে আসলে একজন কুলটার মেয়ে এই কথাটি প্রকাশ পাওয়ার পর পরিবারে মনিময়ের সম্মান কমে যাবে। তার পরিবার হয়ত অনিতাকে গ্রহণই করতে চাইবে না। অবস্থার বিপাকে পড়ে মনিময়কে হয়ত পরিবার ত্যাগ করে অনিতাকে নিয়ে আলাদা থাকতে হতে পারে। এইসব ভাবনা অনিতাকে অস্থির করে তুলে। তাই এই জটিল পরিস্থিতি থেকে মনিময়কে মুক্তি দিতে অনিতা নীরবে তার জীবন থেকে প্রস্থান করে। মনিময়ের প্রতি গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধাই অনিতাকে মনিময়ের থেকে দূরে ঠেলে দেয়। শরৎচন্দ্রের ভাষায়-

'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না-ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।'[৭]

ভাস্কর চৌধুরী তাঁর 'ছোটগল্পের অন্দরমহল' গ্রন্থে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের গল্পকারদের নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন-

''নারী পুরুষের ভালবাসা জীবনের পৃক্তিতে ঐন্দ্রিয় হয়ে উঠেছে সুনীলের গল্পে। অন্যদিকে শীর্ষেন্দুর গল্পে এক বিষণ্ণআত্মমগ্নতার খোঁজ পাই আমরা।... দীপেন্দ্রনাথের গল্পে পেলাম ব্যক্তিক যন্ত্রণার সঙ্গে সমকালীন রাজনৈতিক চেতনার ওতপ্রোত সহবাস। আবার নিম্নবর্গীয় পরিসর নতুনভাবে আলোকিত হয়ে উঠল দেবেশ রায়ের গল্পে।'' [৮]

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমাজ এবং জীবনের সর্বত্র খুঁজে বেড়িয়েছেন অসংখ্য মণি মুক্তো যা তাঁর গল্প সম্ভারকে বহুমাত্রিকতা দান করেছে। তবে ভালবাসার বহু বিচিত্র রূপও নর নারীর সম্পর্কের গভীরতা তথা জটিল মানব মনস্তত্ত্বলেখকের কলমে এতই বর্ণময় হয়ে উঠেছে, যা তাকে চির নবীন করে রেখেছে।

'আগামীকাল' গল্পে লেখক তপন, সুবর্ণা, রণজয় ও ভাস্বতী চরিত্রের মধ্য দিয়ে দেহ সর্বস্ব ভোগবাদী প্রেমের রূপটি পরিস্ফুট করেছেন। দুটি মন এবং সেইসঙ্গে দুটি শরীরের মিলনই তাদের কাছে ভালবাসা। শরীর এবং মনকে যা আনন্দ দেয় তাকে তারা অন্যায় বা পাপ বলে মনে করে না। তাদের কাছে সুখ ও সম্ভোগ একে অপরের পরিপূরক। অত্যন্ত আধুনিক মনস্ক এই তরুণ তরুণী। লেখাপড়ার পাশাপাশি তারা নিজেদের যৌবনকেও গভীরভাবে উপভোগ করতে চায়। নারী পুরুষের অগাধ মেলামেশায় তাদের কোন লজ্জা, ভয় বা সঙ্কোচতা নেই। খোলাখুলি যৌন আলোচনায়ও তাদের কোন আড়ষ্টতা নেই। সুবর্ণা একই সঙ্গে তপন এবং রণজয় দুজনকেই ভালবাসে। অথচ রণজয়ের সঙ্গে সুবর্ণার বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে একথা তপনও জানে। তবে এতে কারোরই কোন আপত্তি নেই। তারা বিশ্বাস করে অন্য কাউকে বিয়ে করলেও নারী বা পুরুষ সবারই এমন কোন বন্ধু থাকতে পারে যার কাছে পরামর্শ চাওয়া যায়, ঘনিষ্টভাবে সময় কাটানো যায়, এমনকি আদরটুকুও নেওয়া যায়। গল্পে সুবর্ণার মধ্যে যদিও বা একটা দ্বিধাবোধ ছিল, কিন্তু তপনের মধ্যে সে ধরনের কোন সংস্কার বা দ্বিধাবোধ নেই। সুবর্ণা রণজয়ের বাক্‌দত্তা জেনেও সে সুবর্ণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিল, অবশ্য সুবর্ণার সম্মতিক্রমেই। কারণ সে জানে সুবর্ণা তাকেও ভালবাসে। বিয়ে করলেই যে শুধু স্বামীকেই ভালবাসতে হবে, অন্য কাউকে ভালবাসতে পারবে না, এমন কথা সে বিশ্বাস করে না। তাই বিয়ের সপ্তাহখানেক আগে এক নির্জন দুপুরে সুবর্ণা যখন তপনের ফ্ল্যাটে আসে, তখন দুজনের সম্মতিক্রমেই ওরা একে অপরের আলিঙ্গনে ধরা দেয়। তপন সুবর্ণাকে ভালবাসে, কিন্তু বিয়েতেই যে ভালবাসার চরম সার্থকতা এটা সে মানতে রাজি নয়। সে একই সঙ্গে একাধিক মেয়েকে ভালবাসে।

রণজয়ের ফ্ল্যাটে গিয়ে সুবর্ণা জানতে পারে রণজয়ও ভাস্বতী নামে একটি মেয়েকে চুমু খেয়েছে, যে অমলেশ নামে অন্য এক পুরুষের ভোগ্যা। ভাস্বতী এক দৃঢ় চরিত্রের মেয়ে। সামাজিক অপবাদ বা নীতিনিয়মের সে ধার ধারে না। মন এবং শরীর যা চায়, তাকেই সে প্রাধান্য দেয়। সে বিশ্বাস করে শরীর ও মনকে উপবাসী রেখে কোন কাজ সুস্থ স্বাভাবিকভাবে করে ওঠা যায় না। ভাস্বতী ও অমলেশ একে অপরকে ভালবাসে, তাই ওরা একসঙ্গে থাকে।

এই গল্পটিতে ভালবাসার এক বিতর্কিত রূপ চোখে পড়ে। আসলে ষাট সত্তরের দশকের অস্থির সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে এক অস্থির মূল্যবোধের বিতর্কিত রূপ লেখক তাঁর এই গল্পে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বৈধ অবৈধ চেতনার বাইরে শারীরিক তাড়না ও মানসিক অনুভবের এক খোলামেলা প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পটিতে। এই গল্পের চরিত্রগুলি বিবাহিত জীবনের ভালবাসার বাইরেও ভালবাসার একটা মুক্ত জায়গা চায়, যেখানে সবাই সবাইকে ভালবাসতে পারে। তপনের কাছে বিবাহ মানেই ভালবাসার মুক্তাঙ্গন ছেড়ে একটি গন্ডীবদ্ধ জীবনে প্রবেশের প্রশস্তিপত্র নয়। একাধিক পুরুষের ভোগ্যা হলেই কেউ অপবিত্র হয়ে যায় না। অর্থাৎ শারীরিক শুচিতা নয়, মনের পবিত্রতাই বড়। লেখক এখানে তথাকথিত 'সতী' নামক ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে এক সংস্কারমুক্ত আধুনিক মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন।

'রাণী ও অবিনাশ' গল্পটিতে ধরা দিয়েছে পরকীয়া প্রেমের এক আবেগঘন মুহূর্ত। বহু বছর পর প্রেমিক অবিনাশ এসেছিল তার পুরোনো প্রেমিকা বিবাহিতা রাণীর সঙ্গে দেখা করতে। রাণী একটি স্কুলে শিক্ষকতা করে। অনেকক্ষণ ধরে স্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার পর অবশেষে রাণীর দেখা মিললো। এত বছর পর এক সময়ের প্রেমিক অবিনাশকে দেখে রাণী তেমন আশ্চর্য বা অপ্রস্তুত হল না। কিছুক্ষণ খুব হালকা মেজাজে কথাবার্তা হল দু'জনের মধ্যে। পুরোনো প্রেমের কথাও হল। বেশ সহজ, স্বাভাবিক, অন্তরঙ্গ কথাবার্তা।

অবিনাশ রাণীর সঙ্গে কিছুটা সময় কাটাতে চায়, ওকে কিছু বলতে চায়। তাই রাণী প্রথমে আপত্তি করলেও পরে বাস ছেড়ে দিয়ে দু'জনে ভর দুপুরে গল্প করতে করতে পায়ে হাঁটা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে। পথ চলতে চলতে ওরা একটা সরু কাঠের সেতুর উপর এসে দাঁড়ালো। অবিনাশ রাণীকে তার মনের কথা জানায়। অবিনাশ ও রাণী দু'জনে দু'জনকে নিজেদের জীবন থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু অবিনাশের শরীর রাণীর শরীরের রহস্য সন্ধানে ব্যস্ত। বহু নারীর সংসর্গে এসেও তার শরীর তৃপ্ত হয়নি। একটা অপ্রাপনীয়ের জ্বালা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। অবিনাশের প্রায়ই মনে হয় রাণীর শরীরের গভীরে লুকিয়ে আছে কোন অজানা রহস্য, যা তার যৌবনকে চরম পরিতৃপ্তির শিখরে পৌঁছে দিয়ে তার আকাঙ্খাকে চিরদিনের মত মুক্তি দিতে সক্ষম হবে। তাই অবিনাশ রাণীর কাছে এসেছে রাণীর শরীরের রহস্য ভেদ করতে।

কিন্তু রাণী তার প্রেমিকের চোখে চিরদিনই এক অসাধারণ রহস্যময়ী নারী হয়ে বেঁচে থাকতে চায়। তাই অবিনাশকে সে কিছুতেই মুক্তি দেবে না। রাণীর কাছেও অবিনাশ তার স্বপ্নের পুরুষ। এই স্বপ্ন নিয়েই সে বেঁচে থাকতে চায়। তাই বাস্তবের অবিনাশকে সে ফিরিয়ে দিল। এমনকি স্বপ্নের অবিনাশকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখার জন্য রাণী পার্থিব জগতের অবিনাশের মৃত্যু কামনা করলো। অবিনাশের আবেদনে রেগে গিয়ে রাণী বলে ওঠে-

"তুই আর আমার সামনে আসিস না। কোনদিন না। সবচেয়ে ভালো হয় তুই যদি এখন মরে যাস্। তাহলে তোকে জেনে ফেলার কোনো ভয়ই আর থাকে না। তা হলেই তোকে আমি চিরকাল ভালবাসতে পারবো।" [৯]

সত্যিই ভালবাসার কী বিচিত্র অনুভূতি। কখনো প্রেমিকের জীবন রক্ষার জন্য প্রেমিকা নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেয়। আবার কখনো বা কোন প্রেমিকা নিজের মনোগহনে তার ভালবাসার স্বপ্নের পুরুষটিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রেমিকের মৃত্যু কামনা করে। রাণী স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করতে চায়, আর মনের গভীরে বাঁচিয়ে রাখতে চায় তার পরকীয়া প্রেমকে। কী বীভৎস প্রেমের অভিব্যক্তি, যা লেখক সুনীলের দ্বারাই সম্ভব।

'মনীষার দুই প্রেমিক' আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের গল্প। এক ধরনের 'নীরবতার বাণী' দিয়ে গল্পটির বিন্যাস। ভালবাসার এক বিশুদ্ধ রূপ গল্পটিকে খুবই কাব্যময় করে তুলেছে। এই ভালবাসা চাওয়া পাওয়ার অনেক ঊর্ধ্বে। প্রেমিকা মনীষার প্রতি তার রূপমুগ্ধ নীরব প্রেমিক বরুণের ভালবাসায় ধ্বনিত হয় শুধুই আত্মনিবেদনের সুর।

এই গল্পে বরুণ ও অমল মনীষার দুই তরুণ প্রেমিক। বরুণ দূর থেকে নীরবে মনীষাকে ভালবেসে যায়, মনীষার ভালবাসার প্রত্যাশা না করেই। মনীষা ভালবাসে অমলকে। বরুণ মনে প্রাণে চায় অমল যেন সব দিক দিয়ে মনীষার উপযুক্ত হয়ে ওঠে। অমল যেন মনীষাকে সুখে রাখে। তার স্বপ্নপরী প্রাণোচ্ছল মনীষা যেন ভাল থাকে।

"আমি মনীষাকে ভালবাসি। মনীষা আমাকে ভালবাসে না। মনীষা অমলকে ভালবাসে।" [১০]

এই নীরব বেদনাময় স্বীকারোক্তির ভিতর দিয়ে গল্পটির শুরু। কোন এক বৃষ্টি ভেজা বিকেলে মনীষাকে কাছে পেয়েও বরুণ তাকে স্পর্শ করেনি, দু'চোখ ভরে শুধু তার সিক্ত সৌন্দর্যটুকু উপভোগ করেছে। বরুণ নিজেকে মনীষার

অযোগ্যভাবে। মনীষার পাশে নিজেকে তার বড্ড বেমানান মনে হয়। মনীষার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা সত্ত্বেও সে কখনো প্রেমিক হয়ে মনীষার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়নি। মনীষাকে সে নিজের থেকে অনেক উচ্চে স্থান দিয়েছে।

"কিসুন্দর ঐ পা দুটো-মসৃণ নরম, এ পৃথিবীতে মনীষাই একমাত্র মেয়ে এই ধুলি মলিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলেও যার পায়ে এক ছিটে ধূলো লাগে না! মনে হল, মনীষার ঐ পা দুখানি হাতের মুঠোয় নিয়ে গন্ধ শুঁকলেআমি ফুলের গন্ধ পাবো।" [১১]

রক্ত মাংসের জীবনের বাইরে নারী সৌন্দর্যের যে শিল্প রূপ তাকে আদর্শের চূড়ায় স্থান দিয়েছে লেখক সৃষ্ট প্রেমিক বরুণ। বরুণের এই প্রেম এক ইন্দ্রিয়াতীত প্রেম। মনীষার চাওয়া পাওয়াকে সম্মান জানাতে বরুণ বারবার নিজেকে বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চেয়েছে সে মনীষার যোগ্য নয়, অমলই মনীষার যোগ্য।

অনাঘ্রাত সৌন্দর্যকে মালিন্যমুক্ত রাখতে এই নীরব প্রেমিকের গোপন আত্মত্যাগ ধাপে ধাপে নাটকীয় পরিণামের দিকে এগিয়ে গেছে। পূজারীর মত সে মনীষার প্রতি তার প্রেমার্ঘ্য নিবেদন করেছে, তাকে ভাল রাখার অঙ্গীকারে। নিজের অস্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে অপ্রাপ্তি ও বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে মনীষার ভালবাসার মানুষ অমলের যোগ্য প্রেমিক হয়ে উঠার কামনা করেছে, তাকে সম্ভাব্য বিপদ থেকে রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে।

একদিন রাতে অমলকে অবনীশ সেনগুপ্তর সঙ্গে দেখে বরুণ ভয়ে, উৎকণ্ঠায় আতঙ্কিত হয়ে উঠে, মনীষার কথা ভেবে। পরদিনই অবনীশের বাড়িতে গিয়ে অমলের সংসর্গ ত্যাগ করার পরামর্শ দেয়, অন্যথায় ফল ভাল হবে না বলে শাসিয়েও আসে।

বরুণ চাইলে মনীষাকে নিজের দিকে টানতে পারতো। কিন্তু সে নিজেকে মনীষার যোগ্য ভাবে না। অমলই তার কাছে মনীষার যোগ্য পুরুষ। বরুণ বলে-

"মাঝে মাঝে দূর থেকে ওদের দু'জনকে দেখি। তৃপ্তিতে আমার বুক ভরে যায়। গ্রীক পুরুষের মতন সুদর্শন অমল, তার মুখ যোগ্য অহংকারে উদ্ভাসিত, প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবীকে জয় করার আস্থা।" [১২]

একদিন বরুণ অমলকে এক সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিজেই বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়লো। অসতর্কতাবশত একদিন অমল একটি ছাগলকে গাড়ি চাপা দিয়েছিল। কিন্তু সে মৃত ছাগলের কোন ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি নয়। জনতা ভীষণ উত্তেজিত ছিল, যে কোন মুহূর্তে গণপিটুনি শুরু হয়ে যেতে পারতো অথবা গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিতে পারতো। অবস্থা বেগতিক দেখে বরুণ নিজেই এগিয়ে আসে মধ্যস্থতা করার জন্য। কিন্তু অমল কোন সহযোগিতা না করে বরং বরুণকে একা বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে কাপুরুষের মত মুহূর্তে সেখান থেকে উধাও হয়ে যায়। অমলের এই নীচতা ও অধঃপতন বরুণকে ভীষণভাবে আহত করে।

অমল ও বরুণ এই দুই চরিত্রের মধ্য দিয়ে লেখক চেনা মহলের প্রবহমান জীবন থেকে গভীর সংবেদনশীলতা দিয়ে মানুষের আস্তিত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক কোরকগুলি উন্মোচিত করতে চেয়েছেন গল্পের বয়ানে। সেইসঙ্গে 'অমল, তুমি যেয়ো না'-এই কাতর আর্তনাদের মধ্য দিয়ে রোমান্টিক ব্যাকুলতাকে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা খুব সহজেই পাঠক মনকে স্পর্শ করে।

এই মনীষা নামেই অন্য একটি গল্পে আমরা লেখকের আরেক মানস প্রতিমার সন্ধান পাই। তবে এই চরিত্রটি একটু স্বতন্ত্র। গল্পটির নাম 'সিঁড়িতে'। এটাকে ঠিক গল্প না বলে হয়ত বা অনুগল্প বলাই ঠিক হবে। কেননা প্লটের বাঁধন

খুবই দুর্বল। তবে নিতান্তই ক্ষণিকের এক দেখাকে কেন্দ্র করে লেখক বর্ণনার গুণে তাকে যেভাবে সাজিয়ে তুলেছেন এটা তার শৈল্পিক দক্ষতার পরিচায়ক।

দশ বছর আগেকার প্রেমিকা মনীষা এক মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েছে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী তার পূর্ব প্রেমিকের সামনে। 'পঁয়ত্রিশ বছর' বয়সটি এখানে তাৎপর্যবাহী। এক নেমন্তন্ন বাড়ির সিঁড়িতে দশ বছর পর হঠাৎ তাদের দেখা। প্রেমিক সিঁড়ি দিয়ে উঠছিল, আর প্রেমিকা মনীষা সেই একই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিল। সঙ্গে ছিল তার স্বামী। সেই এক মুহূর্তের দেখায় অপ্রস্তুত প্রেমিকের মনের গভীর থেকে উঠে এসেছিল একটি প্রশ্ন 'তুমি কেমন আছো?' মনীষা উত্তর দিয়েছিল 'ভালো আছি'। এই ছোট্ট জবাবটুকু দিয়েই সে নেমে গেল, প্রেমিকের কোন কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস না করেই। হঠাৎ প্রেমিকের বুকের ভেতরটা কেমন যেন নাড়া দিয়ে উঠলো। সব কিছুই যেন স্বপ্নের ঘোরের মত মনে হতে লাগলো। সে সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে রইলো। মনে হল যেন অনন্তকাল ধরে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। স্বপ্নের ঘোর কেটে যেতেই চারদিকের অজস্র কথার মধ্যেও মনে হল, মনীষা নেই। একটা তীব্র বেদনা বুকে নিয়ে সে নেমে এলো ভিড় ঠেলে। কিন্তু মনীষাকে পেল না। একটা সাদা গাড়িতে করে সে তার স্বামীর সঙ্গে নেমন্তন্ন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। এখানে 'সাদা গাড়ি'র উল্লেখ করে লেখক ইঙ্গিতে মনীষার শান্ত, সংযত ও নিরুদ্বেগ অবস্থানকে রূপায়িত করেছেন। পুরোনো স্মৃতিকে মুছে ফেলে মনীষা নীরবে এগিয়ে গেছে সম্ভাবনাময় নতুন জীবনের পথে।

হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত অভিমানাহত প্রেমিকের মন নিঃশব্দ চিৎকারে কেঁপে উঠলো, 'তুমি জিজ্ঞেস করলে না, আমি কেমন আছি?' হঠাৎ গির্জার ঘণ্টা বেজে উঠলো গানের মতো। গির্জার সেই মন খারাপ করা ধ্বনির মধ্যে প্রেমিক পুরুষটি শুনতে পেলো মনীষার গলা-

'আমি ভালো নেই, আমি ভালো নেই, আমি ভালো নেই...।' [১৩]

খুবই অল্প কথায় একটি কাতর আবেদনকে লেখক রচনার কৌশলে পাঠক মনে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছেন। প্রেমিকের অপ্রাপ্তির তীব্র বেদনায় বিবাহিত জীবনে আত্মমগ্ন অদৃশ্য প্রেমিকাও হয়ে উঠেছে বিষণ্ণও কাতর। একটি কাব্যিক আবেদন লক্ষ্য করা যায় এখানে। কবিতায় ও গল্পে একাকার হয়ে যাওয়ার এক চমৎকার উদাহরণ গল্পটি। 'মনীষার দুই প্রেমিক' গল্পে মনীষাকে যেমন তার নীরব প্রেমিক বরুণ অনেক ঊর্ধ্বে স্থান দিয়ে নিজের যোগ্যতার বাইরে রেখে দিয়েছে, এই গল্পের মনীষা আবার প্রেমিকের কাছে দূর স্মৃতির মতো, যা হঠাৎই হানা দিয়ে নিঃসঙ্গ করে রেখে যায় তার মানসপ্রিয়াকে, সেই সঙ্গে বিষণ্ণগানের রেশ রেখে যায় প্রেমিকের মনে।

'মঞ্জরী' গল্পটিতেও সেই একমুখী প্রেমের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। এখানে লেখক স্বনামে উপস্থিত। লেখকের পরিচিত এক রূপসী নারী মঞ্জরী। মঞ্জরীর রূপ সৌন্দর্যে লেখক বিভোর। পূজারীর মত তিনি নীরবে মঞ্জরীর সৌন্দর্যের উপাসনা করে যান, মনে কোন প্রত্যাশা না রেখে। লেখক ও মঞ্জরীর মধ্যে কোন প্রেমের গাঢ় বন্ধন তৈরি হয়নি, ছিল শুধুই সহজ সরল অন্তরঙ্গতা। কিন্তু লেখকের সেই রূপ মুগ্ধতা হয়ত মঞ্জরী বুঝতে পেরেছিল। তাই প্রয়োজনে সে লেখকের উপর এক অজানা অধিকার খাটিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধি করে নিত। মঞ্জরীর নীরব প্রেমিক 'সুনীলদা' সেটা বুঝলেও তার দাবি প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা তার ছিল না। সম্মোহিত পতঙ্গের মত লেখক মঞ্জরীর রূপের আগুনে আকৃষ্ট হতেন।

এই গল্পটিতে মঞ্জরী ও কথকের পাশাপাশি সহাবস্থান না থাকলেও গল্পটিকে একটি প্রেমের গল্প হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। মঞ্জরীর রূপ সৌন্দর্য রূপ মুগ্ধ প্রেমিকের বুকে যে শিহরণ জাগাতো, সেই শিহরণই গল্পটিকে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। 'মনীষার দুই প্রেমিক'-এর মত এই গল্পটিও কামনা বাসনার সঙ্কীর্ণতা মুক্ত হয়ে রোমান্টিক গল্পে এর উত্তরণ ঘটেছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি গল্পে একদিকে যেমন দেহাশ্রিত ভোগবাদী প্রেমের প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি আবার কিছু কিছু গল্পে দেহাশ্রিত রূপ সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে প্রেমের হিল্লোল তরঙ্গায়িত হলেও শেষ পর্যন্ত দেহাতীত মানসলোকে এর উত্তরণ ঘটেছে।

আসলে লেখক যে সময়টাতে গল্প জগতে বিচরণ করছিলেন, সেই সময়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল এক অস্থির মূল্যবোধের। পালাবদলের আধুনিকতায় যুব মানস তখন উত্তাল। ভোগ বিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতা যেমন প্রাধান্য পেয়েছে, সেইসঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরোনো মূল্যবোধের উপস্থিতিও সক্রিয় ছিল। রাবীন্দ্রিক প্রেমের এই মোহময় নীরব সৌন্দর্যের মুগ্ধতা তখনও সমাজ থেকে অন্তর্হিত হয়নি। তাই লেখকের প্রেমের গল্পগুলিতে একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রেমের প্রতিফলন ঘটেছে, অন্যদিকে তেমনি ইন্দ্রিয়াতীত রোমান্টিক প্রেমের দ্যোতনাও লক্ষ্য করা যায়।

'নীরার অসুখ' গল্পটি একটি ভিন্ন স্বাদের প্রেমের গল্প। লেখক সুনীলের মানস প্রতিমা এই নীরা। তাঁর সৃষ্টির অনুপ্রেরণাদায়িনী। সুনীলের কাব্যে, গল্পে সর্বত্র নীরার অবাধ বিচরণ। নীরাকে কেন্দ্র করেই লেখকের মানস প্রেমের বিচ্ছুরণ ঘটেছে দিকদিগন্তে। স্নিগ্ধ, লাবণ্যস্নাত, কমনীয় নীরাই যেন অলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে গোটা কলকাতা নগরীকে। নীরার অসুস্থতার সঙ্গে লেখক এখানে কলকাতা শহরের বিপর্যয়কে এক অদ্ভুত রকম যোগসূত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। প্রেমিকের চোখে সমগ্র বিশ্বটাই যেন তার প্রেমিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাইরের কোথাও কোন বিপর্যয় বা অঘটন যেন পরোক্ষভাবে লেখকের প্রেমিকা নীরার কোন অমঙ্গলের অশনিসংকেত।

হঠাৎ তীব্র বর্ষণে জল মগ্ন পথে চলতে গিয়ে অতর্কিতে লেখকের চটি ছিঁড়ে যাওয়া, চোখের সামনে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা, শহরের মিছিল এসবই লেখকের কাছে এক অশনিসংকেত। তিনি বুঝতে পারেন এই লক্ষণগুলি কোন না কোনভাবে নীরার শারীরিক অবস্থাকে প্রতিবিম্বিত করছে। তাই প্রেমিকের মন নীরার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তিনি অনুভব করেন এই বিশ্বসংসার মায়ার প্রতিভাসমাত্র, মনের অবস্থা অনুযায়ী ঘটনার পালা বদল হয়। উৎকণ্ঠিত প্রেমিক নীরার কুশল সংবাদ জানতে নীরার বাড়িতে উপস্থিত হয়ে দেখেন, তাঁর আশঙ্কাই সত্যি। অসুস্থ নীরা বিছানায় শুয়ে আছে, তার মন ভালো নেই। পরবর্তী দু'দিনে নীরার অসুস্থতা যত বেড়েছে, কলকাতা শহরের পরিস্থিতিও ততটাই জটিল আকার ধারণ করেছে। তিনদিন পর নীরা সুস্থ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শহরও তার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে এসেছে। নীরার শরীর ও মন ভালো হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখক অনুভব করলেন বাইরের জগতেও ফুরফুরে হাওয়া বইছে।

এই জগৎ আসলে লেখকের নিজস্ব জগতের প্রতীকমাত্র, যা নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে তারই প্রেমিকা নীরা। নীরাকে কেন্দ্র করে লেখক প্রেমের এক অলৌকিক শক্তির সাংকেতিক প্রতিভাস তুলে ধরেছেন গল্পটির মাধ্যমে। প্রেমের বহু বিচিত্র রূপ ও অনুভূতির এক স্বতন্ত্র প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় গল্পটিতে। চির নবীন কথাশিল্পী সুনীল অন্তর দিয়ে ভালবাসার রামধনুকে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে উপলব্ধি করার প্রয়াস করেছেন, তাই তাঁর প্রেমের গল্পগুলিও স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

বাইরের জগতের সর্বত্রই যেন ছড়িয়ে আছে প্রিয়তমার অস্তিত্ব। সেই অস্তিত্বের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছে লেখকের নিবিড় অনুভূতি। সময় ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভালোবাসার বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধের ও পরিবর্তন হয়েছে। তবে ভালোবাসার রূপ রেখা ও ধরন ধারণের পরিবর্তন হলেও অনুভূতির ক্ষেত্রে শাশ্বত ও চিরন্তন।

পরকীয়া প্রেমের চিত্রণেও কথা সাহিত্যিক সুনীল বেশ দক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন। ভালবাসার কত প্রকোষ্ঠ, কত কোটর, কোনোটাই লেখকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি।

'অপরেশ রমলা ও আমি' গল্পটিতে পরকীয়া প্রেমের এক সজীব চিত্রণ বেশ সুস্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে।

এক সময়ের প্রেমিকা রমলাকে বহু বছর পর হঠাৎ একদিন তার স্বামীর সঙ্গে দেখে প্রাক্তন প্রেমিক নীলুদার বেশ ভালোই লাগলো। প্রেমিকাকে হারানোর কোন যন্ত্রণা সেদিন তার মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেনি, বরং রমলার সুখী দাম্পত্য জীবনের প্রতিভাস তাকে মুগ্ধ করেছিল। সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে রমলাকে সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। রমলাকে কোনদিনই সে তার জীবনে ধরে রাখার চেষ্টা করেনি। তাই রমলার বিচ্ছেদও তাকে বিষাদগ্রস্ত করে তুলতে পারেনি।

কিন্তু সেই হঠাৎ দেখার পর থেকে পুরোনো প্রেমিকের অবচেতন মন খুঁজে বেড়াতো রমলাকে। রমলার নিষেধ সত্ত্বেও একদিন অকারণে রমলার স্বামী অপরেশ রায়ের অফিসে গিয়ে হাজির হয়। অপরেশের অবিশ্বাস ও অসম্মান তাকে চঞ্চল করে তুলে। সে সোজা চলে যায় রমলার কাছে তার ভালোবাসার দাবি জানাতে। স্বামী পুত্র নিয়ে সংসার করা বিবাহিতা রমলাকে জড়িয়ে ধরে সে তার প্রেমের দাবি জানায়। শেষ পর্যন্ত রমলার কাছে প্রত্যাখ্যাত ও অপমানিত হয়ে প্রাক্তন প্রেমিকের নীরব প্রস্থানের মধ্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি। এই গল্পটিকে একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রেমের গল্প বলা যেতে পারে।

গল্পকার সুনীলের অধিকাংশ প্রেমের গল্পগুলি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্বের লেখা। যৌবন রসে পরিপূর্ণ লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রেমকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। গল্পের প্রয়োজনে কখনো কখনো জৈবিক কামনা বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে কিছু কিছু গল্পে, তবে তা অবশ্যই বাহুল্যতাবর্জিত। অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রেম শাশ্বত ও চিরন্তন হলেও প্রকাশ ভঙ্গিমা ও ধরণ ধারণ সময়ের দাবি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে। তাই তাঁর সৃষ্ট প্রেমিকারা নীতিবোধের ঘেরাটোপে বন্দী হয়ে বিরহীনির জীবন যাপনে অভ্যস্ত নয়, আবার সম্পূর্ণ মূল্যবোধ বর্জিত ও নয়। তাই তো বিবাহিতা রমলা স্বামীকে ঠকিয়ে প্রাক্তন প্রেমিকের বাহু বন্ধনে ধরা দিতে চায়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর নায়িকাদের মত তাঁর প্রেমিকাদের উপর বর্ষিত হয় না সমাজের নির্মম কশাঘাত। তাঁর গল্পের বেশীরভাগ প্রেমিকারাই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

গল্পকার সুনীলের প্রেমের গল্পের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো আত্মপ্রকাশ ও স্বীকারোক্তির ভঙ্গি, যেন নিজেকেই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করার এক বিশেষ প্রবণতা। বেশীরভাগ গল্পেই লেখক স্বনামে উপস্থিত, প্রকাশ ভঙ্গিমায় মনে হয় যেন তিনি নিজের জীবনের গল্পই বলে চলেছেন।

কল্পনা ও বাস্তবের যুগলবন্দীতে তাঁর গল্পগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সেইসঙ্গে সময় ও সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কল্লোলিত স্রোতস্বিনীর মত বয়ে চলেছে কালের যাত্রাপথে। অপরেশ, রমলা ও তার নীলুদার মনস্তত্ত্বও সেই দর্পণেই প্রতিফলিত হয়েছে।

পরকীয়া প্রেমের আরেকটি উদাহরণ 'নদীর দুতীর'। গল্পের শুরুটা খুবই হালকা, শরৎকালের বৃষ্টির মত অথবা বলা যায় শীতের শিশির কণার মত। ভাষাটাও হাল্কা সাবলীল ও নমনীয়।

এই গল্পের একটি বিশেষ চরিত্র বন্দনা। বন্দনার মেয়ে স্বপ্নাকে নিয়ে গল্পটি শুরু হয়েছে। সদ্য যৌবনে পা রাখা স্বপ্না নিজেকে নিয়ে বিভোর। নীল রঙের নতুন অরগানজাশাড়িতে নিজেকে মেলে ধরে মুগ্ধ চোখে তন্ময় হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে যেন নিজেকে অনুভব করছিল। তাই বার বার ডাকা সত্ত্বেও কোন সাড়া দেয়নি।

স্বপ্নার মা বন্দনা বছর চল্লিশের এক সুন্দরী নারী। সদ্যোস্নাত মায়ের রূপ সৌন্দর্য মেয়েকে মুগ্ধ করে তুলে। স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসা মায়ের দিকে স্বপ্না মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে উপলব্ধি করে বন্দনার ফিগারটা তখনও কত সুন্দর ও আকর্ষণীয়।

দাম্পত্য জীবনে সুখী বন্দনা কিন্তু পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত। বন্দনা তার কলেজ জীবনের প্রেমিক সঞ্জয়ের সঙ্গে এখনো মাঝে মাঝে দেখা করে। মাসে অন্তত দু'একবার ওরা লুকিয়ে দেখা করে। সঞ্জয়ও বিবাহিত এবং তিন সন্তানের বাবা। তবুও ওরা গোপনে পরস্পরের সান্নিধ্য উপভোগ করে তৃপ্ত হয়।

এই গল্পের আরেকটি পুরুষ চরিত্র বিদ্যুৎ, বন্দনার স্বামী পরিতোষের বন্ধু। দু'একটি কথায় গল্পকার তাকে পাঠকদের কাছে জীবন্ত করে তোলেছেন-

"বিদ্যুৎ এমন একটি দুর্জন, যাকে ভাল না লেগেও উপায় নেই। বিয়ে করেনি, বহু মহিলার সঙ্গে তার সংসর্গ বহু বিদিত। সে খুব সুন্দর কথা বলতে পারে, সাধারণভাবে মহিলাদের স্তাবকতা নয়, তার কথার মধ্যে গভীরতা আছে। সে সত্যিকারের জ্ঞানীলোক, কিন্তু লোকে যাকে 'চরিত্র' বলে, সেটা বেশ দুর্বল।"[১৪]

সেই বিদ্যুৎ মাঝে মাঝে বন্দনার অফিসে আসে তার সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার জন্য। কখনো কখনো নির্লজ্জভাবে বন্দনার যৌবনের প্রশংসা করে। বন্দনা যখন বুঝতে পারে বিদ্যুৎ তারই কিশোরী কন্যা স্বপ্নার দিকে ঝুঁকে পড়ছে এবং স্বপ্নাও বিদ্যুতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন নিজের মেয়েকে বিদ্যুতের কাছ থেকে আড়াল করার জন্য বন্দনা বিদ্যুতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ালো। এ প্রেম নয়, প্রেমের অভিনয় মাত্র, অথবা তাও নয়। এক পুরুষের সঙ্গে দুটি নারীর প্রেমের প্রতিযোগিতার রূপরেখার একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এখানে লক্ষ্য করা যায়। দুই নারীর একজন মধ্যবয়সিনী মা, আর অন্যজন তারই কিশোরী কন্যা। 'নদীর দু'তীর' নামটি তারই ইঙ্গিতবাহী।

ছোটগল্পের ভিতর তার আঙ্গিক ও অবয়বে রয়েছে এক মোহিনী শক্তি, যা জীবনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায়। আবহে ঘনিয়ে আনে এক ব্যতিক্রমী বাস্তবতা। এভাবেই পুনর্নির্মিত হয় গল্পের বিন্যাস, যা আমাদের মুগ্ধ করে, আকর্ষিত করে। এই গল্পও তার ব্যতিক্রম নয়। পুরো গল্পটায় মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন খুবই কুশলতার সঙ্গে অনায়াস দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে মঞ্জুভাষ মিত্র বলেছেন-

"...লেখকের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই তিনি শুরুটা করেন খুব হালকা সহজভাবে অনেক সময় পাঠক যেন কিছু বুঝে উঠতে পারে না, পরে গল্পের শেষে সেই একই পাঠক অবাক হয়ে দেখে লেখক একটা গভীর প্রতীতিতে পৌঁছে গেছেন। জীবনের গভীরতা, মনস্তত্ত্বের বহুমাত্রিক প্রতিফলন, কামনা বাসনার সংঘাত, বুকের ভিতর গোপন রক্তপাত ও অসুখ সবই গল্প পাঠ অন্তে মনের ভিতর জায়গা করে নেয়।"[১৫]

সুনীলের 'উত্তরাধিকার' গল্পটি প্রেমের আদিম প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে লেখা একটি অসাধারণ গল্প। পরিবেশ রচনার কৌশলে গল্পটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। গল্পকার ও তার বন্ধুর এক প্রাচীন নবাব বাড়িতে আগমন উপলক্ষে নবাব বাহাদুর মেহেদী আলির পাঠানো গরুর গাড়িকে কেন্দ্র করে এক লঘু মুহূর্তের মধ্য দিয়ে গল্পটি শুরু হয়েছে।

নবাবের প্রাসাদটি অতি প্রাচীন। অধিকাংশ জায়গা ভেঙ্গে পড়েছে, অনেক ঘরের ছাদ নেই, কোথাও বা জন্মেছে বট অশ্বত্থের মত বিরাট গাছ। সিকি মাইল জুড়ে বিরাট প্রাসাদের স্থানে স্থানে পড়ে আছে নানা রকম ভাঙা মূর্তি, ভাঙা প্রহরী। সিংহদ্বারের সিংহটাও মুণ্ডহীন। তবু এরই মধ্যে প্রাসাদের এক গর্বোদ্ধত চেহারা স্পষ্ট চোখে পড়ে। নবাব মেহদী আলির চেহারাও সেই আভিজাত্যের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

ত্রিশ একত্রিশ বছর বয়সের গৌরবর্ণ অত্যন্ত সুপুরুষ এই মেহদী আলি। খাদ্য ও পানীয়ের এক বিশাল আয়োজনে নবাব গল্পকার ও তার বন্ধুকে আপ্যায়িত করে। নবাব বংশের রক্ত তার ধমনীতে প্রবাহিত হলেও পিতৃপুরুষের নির্মমতায় অর্জিত সম্পদ ও প্রাসাদকে সে ঘৃণা করে। সে নিজেই এই বংশধারার অবসান চায়। তাই দাম্পত্য সম্পর্ক তাকে সন্তান কামনায় উদ্দীপ্ত করে না। তার মধ্যে কাজ করে এক আত্মধ্বংসী প্রক্রিয়া। এই চরিত্রটি যেন শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডী চরিত্রের মতই আত্মবিধ্বংসী ও আবেদনময়।

মেহদী আলি জয়া সান্যাল নামে এক হিন্দু ব্রাহ্মণ কন্যাকে প্রেম করে বিয়ে করেছিল। তখন সে বহরমপুর থাকতো। বিয়ের পর ইসলাম রীতি অনুযায়ী জয়ার নতুন নাম হয় জুলেখা বা জুলি। অপ্সরার মত সুন্দরী এই জুলি। স্ত্রীকে নিয়ে নবাব এই প্রাসাদেই অবস্থানরত। এই গল্পের আরও দু'টি চরিত্র হলো কাশেম আলি ও সোফিয়া। কাশেম আলি নবাবের জ্ঞাতি ভাই এবং জুলেখার গোপন প্রণয়ী। ভালোবেসে মেহদী আলিকে বিয়ে করে এই প্রাসাদে এসে সে যেন বন্দী পাষাণীর জীবন যাপন করছে।

বিয়ের পর জুলেখা অনুভব করেছিল এই সম্পর্কটা কত মিথ্যে, প্রেম করে যে পুরুষটিকে সে বিয়ে করেছিল, বিয়ের পর তাকেই মনে হয়েছে উন্মাদ ও নিষ্ঠুর। স্বপ্ন ভঙ্গের এই ব্যর্থতাবোধ তাকে কাশেমের প্রতি আকৃষ্ট করে। কাশেমকে আঁকড়ে ধরে সে এই বন্দী জীবন থেকে পলায়ন করে মুক্তির স্বাদ পেতে আগ্রহী। আর সোফিয়া হচ্ছে মৌলবী সাহেবের তরুণী কন্যা ও মেহদীর প্রণয়িনী।

গল্পের অন্তিম পর্বটি খুবই মর্ম বিদারক। দৃশ্যটি অনেকটা আদিম কালের মত। একজন নারীর জন্য লড়াই করছে দু'জন পুরুষ। কাশেম আলি জুলেখাকে ভালোবাসে, তাই সে তাকে নিয়ে এখান থেকে দূরে কোথাও চলে যেতে চায়। আবার মেহদী আলিও নিজের স্ত্রীর উপর অধিকার হারাতে চায় না। কাশেমের শক্তিশালী দৃঢ় শরীর, মেহদী আলির নরম তুলতুলে দেহ।

স্ত্রীর উপর অধিকার হারিয়ে মেহদী আলি হিংস্র হয়ে ওঠে। গল্পের শেষে দেখা যায় শক্তিশালী দৃঢ় শরীর নিয়ে কাশেম আলি দৌড়চ্ছে আর মেহদী আলিও তার তুলতুলে দেহ নিয়ে ছুরি হাতে অসম্ভব দ্রুতবেগে কাশেমের পেছনে পেছনে দৌড়চ্ছে। দুর্ভাগ্যবশত কাশেম আলি হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। যে পলাতক, সেই হারে; এ যেন তারই ইঙ্গিত। কাশেম পড়ে যাওয়া মাত্রই মেহদী আলি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রকাশ্য দিনের আলোয় মেহেদী আলির রক্তাক্ত ছুরি ঝলসে উঠলো কয়েকবার। তারপর আত্মতৃপ্তির এক অদ্ভুত হাসি নিয়ে সে ছুরিটা ফেলে দিল মাঠে।

প্রেম ও প্রতিহিংসার এমন জ্বলন্ত ছবি এবং পুরুষের আদিম প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে ভালবাসার দ্বন্দ্ব সংঘাত গল্পটিকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। স্ত্রীর প্রেমিককে শাস্তিদানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব সাহিত্যে অনেক ছোটগল্প রচিত হয়েছে। টলস্টয়ের 'দ্য ক্রুৎজার সোনাটা' গল্পটির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্পের নায়ক তার বিবাহিত স্ত্রীর কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল ঘৃণা ও বিশ্বাসঘাতকতা। তাই কাহিনীর উপসংহারে স্ত্রীর এই বিশ্বাসঘাতকতার বিনিময়ে স্ত্রীকে উপহার দিয়েছিল মৃত্যু। আর 'উত্তরাধিকার' গল্পের নায়ক ঈর্ষার কারণে তার স্ত্রীর প্রণয়ীকে হত্যা করেছিল।

ভালবাসাহীন বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীর মধ্যের মতভেদ ও ঘৃণার ভাব কত তিক্ত ও নিষ্ঠুর হতে পারে এই গল্পটি তারই ইঙ্গিতবাহী। জুলেখার জন্য কাশেমের শরীর যেমন রক্তাক্ত হয়েছে, মেহদী আলির বুকের ভিতরেও তেমনি গোপন রক্তপাত হয়েছে।

'স্বপ্নের একটি দিন' গল্পে রহস্যময়ী মনোলীনা ও শুভ্রর সম্পর্কটাকে কোন বিশেষ সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তরুণী মনোলীনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে একদিন ভর দুপুরে মাঝ বয়সী শুভ্র চলে এসেছিল গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে,

যা তার চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। মনোলীনার সঙ্গে শুভ্রর মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়। কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও হয়নি। অথচ ভর দুপুরে গঙ্গার ধারে মনোলীনার সঙ্গে গাছের নীচে শুয়ে সময় কাটানো ও তাদের কথোপকথন শুনলে মনে হয় দু'জনের মধ্যে কী গভীর বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা।

আসলে জীবনে চলার পথে লেখক বহুমুখী অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন, তাছাড়া তাঁর চিন্তা চেতনাও ছিল বৈচিত্র্যময়। তিনি জানতেন এ পৃথিবীতে এমন কিছু মানুষ জন্মায়, যাদেরকে কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত করা যায় না। তারা আপন খেয়াল খুশি মত চলতে ভালোবাসে, জীবনকে নিজের মত করে উপলব্ধি করতে চায়। আবার তাদের আবেদন এতই আন্তরিক যে সেটাকে কেউ সহজে অস্বীকার করতে পারে না। লেখকের সৃষ্ট এমনই এক চরিত্র এই মনোলীনা। গল্পটিতে আগাগোড়াই মনোলীনাকে এক রহস্যময়ী তরুণী বলে মনে হয়। ক্ষণপ্রভার মত সে হঠাৎ একদিন শুভ্রর জীবনে উদিত হয়ে এক মুঠো মুক্ত বাতাসের আস্বাদ দিয়ে গেল। প্রকৃতির বুক থেকে তুলে আনা এক গুচ্ছ ঘাস মনোলীনা উপহার দিয়েছিল শুভ্রকে। মনোলীনা হারিয়ে গেলেও সেই ঘাসটুকু শুভ্রর জীবনে স্বপ্ন নয়, সত্যি হয়েই রইলো। এ এক বিচিত্র উপলব্ধি।

মানুষ তৈরি করে সমাজ এবং সমাজ তৈরি করে মানুষের জন্য কিছু শৃঙ্খলা। এই পারস্পরিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের ঘেরাটোপে মানুষের ধারাবাহিক জীবনের গতি প্রবাহিত হয়। কিন্তু লেখক সুনীল গতানুগতিকতার বাইরে কিছু মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে, উপলব্ধির সততায় ও বাচনের কারুকার্যে।

সুনীল ছিলেন সংসারের এক সন্ন্যাসী, এক উদাসীন, অথচ প্রেমিক মানুষ। তিনি প্রতিটি মানুষকে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসতেন। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন-

"আমার ভালোবাসার কোনো জন্মহয় না-
মৃত্যু হয় না-
কেননা আমি অন্য রকম ভালোবাসার হীরের গয়না
শরীরে নিয়ে জন্মেছিলাম।" [১৬]

ভালবাসা তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল নানা রঙে, নানা বর্ণে ও নিত্য নতুন জীবন দর্শনের প্রেক্ষাপটে। তাই তাঁর প্রেমের গল্পগুলি গতানুগতিকতার ফ্রেমে আঁটা ধারাবাহিকের গন্ডী পেরিয়ে বৈচিত্র্যের নীল দিগন্ত স্পর্শ করেছে। প্রত্যেকটি গল্পে প্রেম ধরা দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন জীবনদর্শনের মাধ্যমে। বেশীরভাগ গল্পই তাই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

'বাইরের আলো' গল্পে লেখক মনীশ ও তার দূর সম্পর্কের মাসতুতো বোন ইন্দ্রাণীর সম্পর্কটাকে আকারে ইঙ্গিতে পাঠকের সামনে বেশ সাবলীলভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। বহুবার বিদেশে ভ্রমণ করার সুবাদে পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি, পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বও পাশ্চাত্যের বহু জায়গা সম্বন্ধে লেখকের খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল। পাশ্চাত্যের বহু সাহিত্য সম্মেলনেও তিনি যোগদান করেছিলেন। তাই তাঁর বহু গল্প বিদেশের পটভূমিতে রচিত। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার সংমিশ্রণে রচিত গল্পগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিরাজমান।

বহু বছর পর বিদেশের মাটিতে নিজের বাসস্থানে একসময়ের প্রেমিকা ও আত্মীয়া ইন্দ্রাণীকে দেখে মনীশ মোটেও উচ্ছ্বসিত হয়নি। নেহাত ভদ্রতার খাতিরে কুশল বিনিময় হয়। এমনকী ইন্দ্রাণী প্রথমবার তার বরকে নিয়ে বিদেশের মাটিতে পা রাখছে জেনেও মনীশ তাদের অভ্যর্থনা জানাতে এয়ারপোর্টে যায়নি, তার এক বিশ্বস্ত অনুচর ভেঙ্কটকে পাঠিয়েছিল। ওরা যখন বাসায় আসে তখনও অতিথি আপ্যায়নের জন্য মনীশ ঘরে ছিল না।

বিদেশীরা কাজের প্রতি খুব নিষ্ঠাবান হয়, তাই সহজে ফাঁকি মারতে পারে না। লেখক এখানে মনীশ চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরেছেন। মনীশ সুদীর্ঘ দশ বছর ধরে বিদেশে থাকতে থাকতে তাদের এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যটি নিজের অজান্তেই বেশ রপ্ত করে নিয়েছে। সেইসঙ্গে ইন্দ্রাণীর প্রতি তার অনুভূতির উষ্ণতাও কমর্ব্যস্ততা ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বরফের মত কঠিন ও শীতল হয়ে গেছে। একদিন ইন্দ্রাণীর বিয়ে মনীশকে চঞ্চল করে তুলেছিল, তাই সে নিজেকে সংযত করতে বিদেশে পালিয়ে এসেছিল। অথচ আজ দশ বছর পর ইন্দ্রাণীকে নিজের বাড়িতে আসতে দেখেও মনীশের মনে কোন উচ্ছ্বাস জাগেনি।

ইন্দ্রাণী বরকে নিয়ে মনীশের সীডার র‍্যাপিডসের বাসায় এলেও সে মনীশের সঙ্গে একান্তে কিছুটা সময় অতিবাহিত করতে চায়। মনীশ কিন্তু তাতে সায় দেয়নি। সে আগাগোড়াই ইন্দ্রাণীকে এড়িয়ে গেছে। সহজ, সাধারণ আতিথেয়তার বাইরে সে পা বাড়ায়নি। ইন্দ্রাণী মনীশকে ভালোবাসে, কিন্তু সমাজের ভয়ে বিয়েতে রাজী হয়নি। অন্যদিকে মনীশ সামাজিক বাধা নিষেধের গন্ডীতে নিজেকে বেঁধে রাখতে চায়নি। সামাজিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সে ইন্দ্রাণীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

দশ বছর পর দৃশ্যটা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। মনীশ ইন্দ্রাণীর প্রতি উদাসীন, আর ইন্দ্রাণীর তৃষিত হৃদয় খুঁজে বেড়ায় মনীশের গোপন সান্নিধ্য।

মানব মনের এই পট পরিবর্তন সুনীল খুব দক্ষতার সঙ্গে মনোগ্রাহীরূপে চিত্রিত করেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে আছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব জীবনের প্রতিফলন। প্রেম প্রীতি, ভালোবাসা, স্নেহ, সৌহার্দ্য পারিবারিক গন্ডির ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, নারী পুরুষের পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হওয়ার দুর্বার আকাঙ্খা বারবার তাঁর গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে। আপাত সাধারণ কোন বিষয়কে কথকতার নিপুণ বিন্যাসে তিনি আকর্ষণীয় করে তুলতে পারতেন।

‘পূজারী’ গল্পেও পরকীয়া প্রেমের একটি ঝলক প্রকটিত হয় গল্পের সমাপ্তিতে এসে। দাম্পত্য জীবনে সুখী সুপ্রিয়া তার বাল্য প্রণয়ী অভিজিতের সঙ্গে বহু বছর ধরে গোপনে সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছে স্বামীর অজান্তে। গল্পের শুরুতে পাঠক মনে সুপ্রিয়ার যে ভাবমূর্তি ছিল, গল্পের সমাপ্তিতে এসে সেই মূর্তি একেবারেই বিনষ্ট হয়ে যায়। স্বামীর বন্ধু শশধর যাকে সে অবজ্ঞা করে, ঘৃণা করে সেই সুন্দরের পূজারী সরল হৃদয়ের শশধরের নামের আড়ালে সে যে অবৈধ ব্যভিচারে মেতে ওঠে, তার সেই প্রতারণা তাকে পাঠকের চোখে কলঙ্কিত করে তুলে।

গল্পকার সুনীল নারীর স্নেহময়ী, প্রেমময়ী ও মমতাময়ী রূপের পাশাপাশি তার ছলনাময়ী রূপটিকেও ব্যঞ্জিত করেছেন ‘পূজারী’ গল্পের সুপ্রিয়া চরিত্রের উপস্থাপনায়। নিজের ব্যভিচারকে আড়াল করতে সুপ্রিয়া যে কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে, তার সেই প্রতারণার জন্য পাঠকমনে সুপ্রিয়ার জন্য উদ্‌ভূত ধিক্কার চরিত্রটিকে বাস্তবের জমিতে টেনে নামিয়েছে। তাঁর প্রেমের গল্পগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় প্রেমের মনোগহনের সর্পিল পথে গল্পকার সুনীলের স্বচ্ছন্দ আসা-যাওয়া। তাই তো প্রেমের মাধুর্য ও অন্তর্গূঢ় জটিলতা তিনি এত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

‘সীমান্ত প্রদেশ’ গল্পে লেখক মানব মনের এক জটিল রূপ গল্পের আকারে পাঠকদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। মানুষের জীবনযাত্রা, বাহ্যিক ব্যবহার, সামাজিক বন্ধন এসব কিছুই নির্দ্দিষ্ট নিয়মের আওতাধীন। কিন্তু মানব মন ও মনস্তত্ত্বকে কোন নির্দিষ্ট ছকে বাঁধা যায় না। মানুষে মানুষে এর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও মানুষের চিন্তা চেতনার উপর তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও সমাজ ব্যবস্থা কিছুটা প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তবুও অন্তরের অন্তঃস্থলে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের স্বকীয়তা বিদ্যমান। লেখক ‘সীমান্ত প্রদেশ’ গল্পটিতে হীরেন চরিত্রের আধারে সেই স্বকীয় চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

হীরেন তার স্ত্রী ললিতাকে নিয়ে বাল্যবন্ধু হেমকান্তির পুরুলিয়ার বাসায় বেড়াতে এসেছে। দুই বন্ধুর মধ্যে খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। কিন্তু সম্পর্ক যতই গভীর হোক না কেন, নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে বন্ধু চুমু খাচ্ছে দেখলে যে কোন পুরুষ মানুষই উত্তেজিত হয়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। হীরেন কিন্তু উত্তেজিত হয়নি। বরং সেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে ওদেরকে অপ্রস্তুত না করে সে নিজেই সেখান থেকে পালিয়ে যায়। হীরেন স্ত্রীকে খুব ভালোবাসে। তাই বারবার সে নিজের মধ্যেই যুক্তি খোঁজে বেড়ায় ললিতাকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য। হেমকান্তির বন্ধুত্বও সে হারাতে চায় না। তাই পুরুষ মানুষের এটি একটি স্বভাবসিদ্ধ স্বাভাবিক আচরণ বলেই সে সেটা মেনে নিতে চায়।

আমাদের চোখের আড়ালে প্রতিনিয়ত এ ধরনের কত ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রতিটি মানুষের জীবনেই কম বেশি কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা থাকে, যা তাদের একান্তই ব্যক্তিগত। কখনো ইচ্ছায়, কখনো অনিচ্ছায় ঘটে যাওয়া সেই মুহূর্তগুলির কোন মূল্যায়ন হয় না, যতক্ষণ না কারো চোখে পড়ে। লেখকের ব্যক্তিগত জীবনেও কিছু অভিজ্ঞতা ছিল, যা তিনি তাঁর 'অর্ধেক জীবন' গ্রন্থে অকপটে স্বীকার করেছেন। তাই লেখক সৃষ্ট হীরেন চরিত্রটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

সামাজিক বিধি নিষেধের শৃঙ্খলে বন্দী মানুষ। কিন্তু মনকে সব সময় শৃঙ্খলিত করে রাখা যায় না। কোনো কোনো বিশেষ মুহূর্তে সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে অথবা বলা যায় অসংযমী। মনের সেই সংযমহীনতা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তির চোখে পড়ে না, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা অন্যায় বলে বিবেচিত হয় না। লেখকের হীরেন চরিত্রটি যখন নিজের স্ত্রীকে বন্ধু হেমকান্তির সঙ্গে চুমু খেতে দেখে, তখন সে উত্তেজিত না হয়ে নিজের অতীতে অবগাহন করে। সেও তার অতীত জীবনে অনেক মেয়েকেই চুমু খেয়েছে, এমনকী নিজের সম্পর্কিত সেজোমামীকেও। কিন্তু কেউ সেটা দেখে ফেলেনি বলে অন্যায় বলে বিবেচিত হয়নি এবং কারো জীবনেই কোন ছন্দপতন ঘটেনি। হীরেন নিজের স্ত্রীকে মনে মনে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য নিজের স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে বেড়ায়। যে অন্যায় সে নিজেও একদিন করেছে সেই একই অন্যায়ের জন্য আজ স্ত্রীকে শাস্তি দিতে পারে না, এমনকী বন্ধুকেও না। অথচ সামাজিক বিধি নিয়মে সেটা অন্যায়। তাই সে স্বচক্ষে সব কিছু দেখেও ওদের অজান্তেই সেখান থেকে চলে যায়, কোন প্রশ্ন বা প্রতিবাদ না করেই।

সারাদিন ধরে হীরেনের মধ্যে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ললিতাকে ক্ষমা করতে গিয়ে নিজের অতীতে ঘটে যাওয়া কোন এক বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সে অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ে। সেই অপরাধবোধ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার লক্ষ্যে তার জীবনের সেই গোপন কথাটি সে অকপটে স্ত্রীর কাছে স্বীকার করে দায়মুক্ত হতে চেয়েছে, সেই সঙ্গে এটাও দেখতে চেয়েছে যে তার সেই অপরাধের কথা জানার পরও স্ত্রী যদি তাকে ভালোবাসতে পারে তাহলে হীরেনেরও উচিত স্ত্রীকে অন্তর থেকে ক্ষমা করে দেওয়া।

এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে গল্পটি এগিয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে আত্মসমর্পণের মীমাংসায় গল্পটির অবসান ঘটেছে। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মবিশ্লেষণ মানব জীবনের এক চরম সত্য ও পরম উপলব্ধি, যা লেখক সুনীলের কলমে বাস্তব রূপ পেয়েছে।

ছোটগল্পে প্লট, চরিত্র, সংলাপ, প্রেক্ষাপট ও মনস্তত্ত্বের উপস্থিতির পাশাপাশি লেখকের জীবনদর্শনের ও পরিচয় পাওয়া যায়। এই জীবন দর্শন গল্পে বিভিন্ন ঘটনার আবহে একটু একটু করে অবয়ব নিয়ে পাঠকের চোখে ধরা দেয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প সম্ভার পড়লে তার যে জীবন দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়, ভালোবাসা ও মুগ্ধতায় তাঁর পাঠককুলকে আবিষ্ট করে তোলে।

তাঁর স্বনামে লেখা অনেক গল্পে তিনি এমন কিছু স্বীকারোক্তি করেছেন, যা শুধু সুনীলের পক্ষেই সম্ভব। যৌনতা তাঁর লেখার একটা বড় অংশ জুড়ে আছে। যৌনতা জীবনেরই একটা বিশেষ অংশ। তাকে তিনি উপভোগ করতে জানতেন এবং গভীর ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে গল্পে তাকে প্রতীক করতেন। তাই তাঁর গল্প কখনো পর্ণ হয়নি। 'আমার একটি পাপের কাহিনী' গল্পে যেভাবে তিনি নির্দ্বিধায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে উন্মোচিত করেছেন, তা একদিকে যেমন তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাকে তুলে ধরে, তেমনি তাকে প্রচলিত বাঙালিয়ানার সীমার বাইরে নিয়ে গিয়ে বিশিষ্ট করে তোলে। পূর্ববঙ্গের এক অজ পাড়া গাঁয়ে জন্মেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা পাশ্চাত্য চরিত্রের ছিলেন। এই গল্পটিকে লেখকের একটি আত্মজৈবনিক গল্পও বলা যায়।

বিদেশ ভ্রমণ উপজাত 'আমার একটি পাপের কাহিনী' গল্পে রয়েছে আমেরিকার পট। তিনি আমেরিকার আয়ওয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ে রাইটার্স ওয়ার্কশপে আমন্ত্রিত হয়ে বহুদিন সেখানে ছিলেন। এই গল্পটিতে তিনি নিজের নাম এবং পেশায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। প্রকাশভঙ্গিতে মনে হয়েছে লেখকেরই জীবনের গল্প। তবে যেহেতু এটি গল্প, তাই সত্যতা যাচাইয়ের কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

লেখকের জবানীতে, তিনি যখন আমেরিকার অ্যারিজোনায় ছিলেন তখন একদিন পার্টিতে মোনিকা নামে এক ইতালিয়ান মেয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই পরিচয় খুব শীঘ্রই অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হল। মোনিকার সঙ্গে লেখকের বেশ কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্ত তিনি নির্দ্বিধায় পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েও নারী সংসর্গ লাভ করাকে তিনি অন্যায় বা পাপ বলে মনে করতেন না, যদিও এটি আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী নয়। তিনি জীবনে একাধিক নারীর সংসর্গে এসেছিলেন একথা তিনি নিজেই অকপটে স্বীকার করেছেন।

মানুষ মাত্রেই কাম, ক্রোধ, লোভের বশবর্তী হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। তাঁর প্রাণপ্রিয় মোনিকা যখন অসুস্থ মাকে দেখার জন্য বিমানে করে বাড়ি চলে যায়, তখন বিমান বন্দরে সে একটা ইন্সিয়রেন্স করে, যার নমিনি দিয়েছিল লেখক অর্থাৎ তার প্রেমিককে। সেই ইন্সিয়রেন্সের কাগজটি হাতে নিয়ে বার বার লেখকের মনে হয়েছে যদি বিমান দুর্ঘটনায় মোনিকা মারা যায়, তাহলে ইন্সিয়রেন্সের এক লক্ষ বারো হাজার টাকার উত্তরাধিকারী হবেন তিনি। মোনিকাকে প্রগাঢ় ভালোবাসা সত্ত্বেও বার বার মোনিকার মৃত্যুর চিন্তা তাকে ভাবিত করে তোলায় তিনি নিজেকে পাপী মনে করেছেন এবং গল্পটিকে 'আমার একটি পাপের কাহিনী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। মোনিকার সঙ্গে জৈবিক সম্পর্কটা তাঁর কাছে পাপ নয়, কিন্তু একটি মেয়েকে ভালোবেসে বার বার তার মৃত্যুর ভাবনাটাকে তাঁর পাপ বলে মনে হয়েছে এবং একথাটি তিনি মোনিকার কাছেও স্বীকার করেছেন। এমন অকপট স্বীকারোক্তি খুব কম লোকই করতে পারে। এটি তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তারই পরিচায়ক।

'বিশাখা' গল্পটির মাধ্যমে লেখক ভালোবাসার অন্য এক রূপ পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। কিছু কিছু ভালোবাসা মনের গহনে অতি গোপনে দানা বেঁধে ওঠে, যা অনেক সময় সেই মানুষটিও উপলব্ধি করতে পারে না। জীবনের কোন এক বিশেষ মুহূর্তে তা হঠাৎই প্রেমিকের চোখে ধরা দেয়। এই ভালোবাসায় কোন কামনা বাসনার আকাঙ্খা থাকে না। নিজের মধ্যেই তা সীমায়িত। গল্প কথক সুনীল তার বন্ধুর স্ত্রী তথা ছোটবোনের বান্ধবী প্রতিবেশিনী বিশাখার প্রতি কোনদিনই কোন বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেননি। তিনি বিশাখার সঙ্গে সিনেমায় গেছেন, পার্কেও বেড়িয়েছেন কিন্তু তা কোন প্রেমিকাসুলভ আকর্ষণের জন্য নয়। বিশাখার বিয়েও তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলতে পারেনি, বরং তিনি নিজেই বিশাখাকে বিয়ের পিঁড়িতে করে ঘুরিয়েছেন।

বিশাখার বিয়ের পর তার স্বামী দেবনাথ যখন ঘোষের দায়ে সাসপেন্ড হলো, তখন বিশাখা কথকের উপরেই দায়িত্ব দিয়েছিল সত্যিটা খুঁজে বের করার জন্য। নিজের অজান্তেই কথক সুনীলের উপর তার এক বিরাট নির্ভরযোগ্যতা তৈরি হয়েছিল। বিশাখার স্বামী দেবনাথ একদিন প্রসঙ্গক্রমে স্পষ্ট করেই বলেছিল বিশাখা সুনীলকে ভালোবাসে।

সুনীলও শেষ পর্যন্ত নিজের অন্তরে বিশাখার প্রতি এক প্রগাঢ় ভালোবাসা অনুভব করেছিলেন, যা দুর্লভ মানিকের মত তাঁর হৃদয় সমুদ্রের অতল গর্ভে সঞ্চিত ছিল, যার খোঁজ কেউ কোনদিন পায়নি।

এই গল্পটির আরেকটি চরিত্র মনুজেশ, যে শুরু থেকেই বিশাখার প্রণয় প্রার্থী। মনুজেশকে এড়িয়ে বিশাখা দেবনাথকে বিয়ে করার পরও বিশাখার প্রতি ভালোবাসাকে মনুজেশ গোপনে লালিত করে গেছে। বিশাখার বিপদের দিনে সে সর্বাঙ্গীনভাবে বিশাখার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত দেবনাথের বিধবা স্ত্রী বিশাখাকে সন্তান সহ গ্রহণ করতেও প্রস্তুত হয়।

এই গল্পে ভোগ ও ত্যাগের বাইরে ভালোবাসার এক নির্মল, স্নিগ্ধ রূপ পাঠকের চোখে ধরা দেয়, যা লাভ ক্ষতির সীমানা পেরিয়ে নিরাপদ আশ্রয় রূপে ভালোবাসার মানুষটিকে বাস্তব জগতের ঝড় ঝাপটা থেকে আগলে রাখতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

বেশ কিছু গল্পতেই লেখকের বাস্তব জীবনের বহু ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। কিছু কিছু ঘটনা হয়ত বাস্তবে সত্যি সত্যিই সংগঠিত হয়নি, রচনার শিল্পগুণের তাগিদে কিছুটা কল্পনার সংযোজন ঘটেছে। কেননা শিল্পেরও একটা অলীক বাস্তবতা থাকে।

প্রেম আর তারুণ্য কথাশিল্পী সুনীলের গল্পের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। বারবার জীবনের নানা স্তরে, নানা প্রেক্ষিতে, নানা বিরোধাভাসের মধ্যেও তা ধরা দেয়। তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোর মতোই তাঁর নিজের মধ্যেও প্রথা ভাঙার এক দুঃসাহস নিরন্তর কাজ করে চলেছে। গল্পের প্রচলিত ছন্দকে পাল্টে দেবার একটা দুঃসাহস তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। সব সময়ই যে তিনি সফল হয়েছেন, তা অবশ্য নয়। তবে ভালো, মন্দ, মাঝারি সব মিলিয়ে লেখকের গল্প সম্পর্কে একথাটি অবশ্যই বলা যায় যে তাঁর গল্পের নিজস্বতাই তাঁর গল্পের বিশিষ্ট স্বাদ ও বৈশিষ্ট্য। লেখকের বেশিরভাগ প্রেমের গল্পগুলো গতানুগতিক প্রেমের গল্পের গন্ডীর বাইরে গিয়ে গল্পগুলিকে এক বিশিষ্টতা দান করেছে। তিনি একই সঙ্গে রোমান্টিক ও আধুনিক। রোমান্টিকতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন-

"অতিবাস্তববাদীদের ভাবনায় রোমান্টিকতার ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে অ-বাস্তব কল্পনা কিন্তু রোমান্টিকতা প্রকৃতপক্ষে সেই মনো মুহূর্ত যখন মানুষ ক্ষণকালের জন্য হলেও একান্ত বাস্তবতার বাতাবরণ থেকে নিষ্কাশিত করে নিতে পারে এমন একটি অনুভব যা তাকে বাস্তবের কল্পনা বিহীন তথ্য সর্বস্বতা থেকে তুলে আনতে পারে এক বর্ণময় কল্পমায়ার জগতে, তথ্য উত্তীর্ণ মানস ভুবনে।" [১৭]

প্রেম ও ভালবাসার তাৎপর্য মানুষের জীবনকে কেমন করে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, কি করে তাদের অন্তরকে উদ্ভাসিত ও ঐশ্বর্যমন্ডিত করে তোলে তারই এক রূপক অনুষঙ্গে গড়ে তোলা গল্প 'স্বর্গের বারান্দায়'। এটি ঠিক কাহিনী ভিত্তিক গল্প নয়, প্রচ্ছন্ন কিছু চৈতন্যকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কতকগুলো খন্ড দৃশ্যায়িত ঘটনা কোনো এক নির্দিষ্ট বক্তব্যের দিকে এগিয়ে গেছে। স্বপ্ন ও বাস্তবের সীমা রেখা ছুঁয়ে প্রেম ও প্রেমহীনতা সমান্তরালভাবে পাশাপাশি চলেছে।

লেখকের বন্ধু নির্মল হঠাৎ এক অগ্নি দুর্ঘটনায় ইহলোক ত্যাগ করেছে নারী স্পর্শ সুখ বঞ্চিত ভালোবাসার অতৃপ্তি বুকে নিয়ে। আবার বন্দনা নামে লেখকের এক ব্যর্থ প্রণয়িনী পুরুষের প্রতি ভালোবাসার তীব্র তৃষ্ণা বুকে নিয়ে এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিল। হাসপাতালে মৃত্যু শয্যায় শুয়ে বন্দনা শেষ বারের মত চিঠির মাধ্যমে লেখককে কাতর আবেদন জানায়, তিনি যদি তাকে একবার চুমু খেয়ে যান, তাহলে সে পরম তৃপ্তি লাভ করবে ও শান্তিতে মরতে পারবে। কিন্তু লেখক বন্দনার আবেদনে সাড়া না দেওয়ায় ভালোবাসাহীনতার এক চরম অতৃপ্তি বুকে নিয়ে বন্দনা

এক অজানা জগতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। শেষ পর্যন্ত স্বর্গের বারান্দায় দুটি অতৃপ্ত হৃদয়ের মিলনের মধ্য দিয়ে গল্পের সমাপ্তি।

বাস্তবে দুই নারী পুরুষ প্রেমহীনতার ব্যথা বুকে নিয়ে এ পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেও পরাবাস্তবে তাদের অতৃপ্ত আত্মার মিলন ঘটেছে। এই গল্পটিতে বিভিন্ন ঘটনার ঘন ঘটায় বাস্তব ও পরা বাস্তবকে একত্রে মিলিয়ে দেবার এক বিচিত্র প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তবে একটি বিশেষ উপলব্ধি ছাড়া গল্পাকৃতির এই রচনাটির পায়ের তলায় মৃত্তিকা নেই বলেই মনে হয়।

পৌরাণিক ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত একটি বিশিষ্ট ছোটগল্প 'স্বর্গদর্শন' । গল্পটির প্রেক্ষাপট পৌরাণিক হলেও লেখকের নিজস্ব চিন্তা চেতনার সংমিশ্রণে তিনি ভালোবাসার এক মুক্তাঙ্গন তৈরি করে নিয়েছিলেন। গল্পটিতে রকেটে করে নভোচারী দেবতার সঙ্গে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহন গল্পটিতে আধুনিকতার ছোঁয়া এনে দিয়েছে। এখানে স্বর্গ যেন চন্দ্র বা মঙ্গলের মতোই কোন এক গ্রহ। তবে এই গ্রহ স্বর্গে যুধিষ্ঠির ছাড়া সবাই মৃত্যুর পর অশরীরী শক্তি হয়ে প্রবেশ করেছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত ভীষ্ম, দুর্যোধন, কর্ণ সবাই মৃত্যুর পর এই স্বর্গ রাজ্যের অধিবাসী হয়েছেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে সশরীরে স্বর্গে এনে পরীক্ষা করা হচ্ছে তাঁর শরীরে লোভ, মোহ ও হিংসার মত রিপুগুলি মুছে ফেলা যায় কিনা। নভোচারী দেবতার সঙ্গে কৌতুক রস মিশ্রিত আলাপের মধ্য দিয়ে যুধিষ্ঠির এসে স্বর্গে পৌঁছান। তিনি প্রথমেই ভীষ্ম পিতামহের সঙ্গে দেখা করে এই গ্রহের রীতি নীতি ও তথ্য সম্পর্কে জেনে নিতে চান। কিন্তু প্রথমেই কর্ণ ও দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা হয়। তারা বসে আছেন দ্রৌপদীর অপেক্ষায়। দুর্যোধন স্পষ্টই একথা বলে দিলেন। কর্ণের মুখে কোন কথা নেই। তিনি বসে আছেন ভোগের অপেক্ষায়। জিতেন্দ্রিয় যুধিষ্ঠির স্বর্গে এসে হঠাৎ ক্রোধের বশবর্তী হয়েও নিজেকে সংযত করে নিলেন। কিছুক্ষণ পর দ্রৌপদী এসে পৌঁছালেন সেখানে। কর্ণ ও দুর্যোধনের মধুর সম্ভাষে দ্রৌপদীও সহাস্যে সাড়া দিলেন। কর্ণ ও দুর্যোধন সরাসরিই দ্রৌপদীর সঙ্গে মিলনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। দ্রৌপদীও তাই। কর্ণ যেহেতু বয়োজেষ্ঠ ও দ্রৌপদীর স্বয়ম্ভর সভায় লক্ষ্যভেদের সময় থেকেই দ্রৌপদীর প্রণয়প্রার্থী, তাই তারই অগ্রাধিকার। দ্রৌপদী এসে সানন্দে কর্ণের প্রশস্ত বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ভোগের সাগরে ডুবে গেলেন। যুধিষ্ঠির আড়াল থেকে এই দৃশ্য দেখে কিছুতেই আত্ম সংবরণ করতে পারলেন না। সহ্যশক্তি ও শুভবোধের মানবিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুধিষ্ঠির স্বর্গে এসে ক্রোধ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে পরাস্ত হলেন। ষড়রিপু জয় করে স্বর্গলোকে পৌঁছেও প্রিয়তমাকে পরগামিনী দেখে যুধিষ্ঠিরের চোখে জল এসে গেল।

পৌরাণিক গল্পে কিছুটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগিয়ে লেখক একদিকে যেমন দ্রৌপদীকে কেন্দ্র করে কর্ণ ও দুর্যোধনের গোপন কামনা বাসনাকে মুক্তি দিলেন, তেমনি দেখালেন সশরীরে স্বর্গে এসেও যুধিষ্ঠির একজন নারীর জন্য ক্রোধ ও হিংসার বশবর্তী হয়ে পরাস্ত হলেন। অথবা বলা যায় স্বর্গে এসেও সাধারণ মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণরাখলেন। নিজের স্ত্রীকে অন্য পুরুষের অঙ্কশায়িনী হতে দেখে ক্রোধে তার অন্তর দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো। স্বর্গের আকাঙ্খা থেকেও স্ত্রীর উপর অধিকার হারানোর বেদনা ও ক্রোধ যুধিষ্ঠির চরিত্রে জাজ্জ্বল্যমান। তাই দেবতারা যদি তার এই অসংযত চিত্ত বৈকল্য দেখে তাকে স্বর্গের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন, তাতেও যুধিষ্ঠিরের কিছু যায় আসে না। শেষ পর্যন্ত দেব রাজ্যে এসেও মনুষ্যত্বেরই জয় হলো।

এই গল্পটি লেখকের কল্পনাশক্তির বৈচিত্র্য হিসেবে অবশ্যই মনে রাখার যোগ্য। এই গল্পে ও বাস্তব ও পরাবাস্তবের এক অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। কর্ণ ও দুর্যোধনের যে কামনা বাসনা বাস্তবে অপূর্ণ থেকে গেছে স্বর্গ নামক পরাবাস্তবে দ্রৌপদীর সঙ্গে মিলনে এর পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

'প্রেমিক ও স্বামী' গল্পে লেখক খুব হালকা ও ঝকঝকে ভাষায় প্রেমকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাধারণ মানব মনস্তত্ত্বের এক মজাদার উপলব্ধিকে উপভোগ করার একটা পরিসর তৈরি করে দিয়েছেন। গল্পটিতে কোন জটিলতা নেই।

দাম্পত্য জীবনের কোন মালিন্য বা সমস্যাও তুলে ধরা হয়নি। কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে লেখকের জীবনদর্শনের একটা স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়।

দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী পুরুষ একে অপরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও একটা বাহ্যিক প্রেমসুলভ মধুরতা ও একটি হালকা আকর্ষণ অনুভব করতে দেখা যায় এই গল্পের চরিত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে। শান্তা ও নিখিল এবং অলোক ব্যানার্জি ও মমতা গল্পের দুই দম্পতি। শান্তা ও নিখিল যখন হনিমুন করতে দার্জিলিং এ যায় তখনই ওদের আলোক ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা। বিবাহিত শান্তার প্রতি অলোক ব্যানার্জির এক মধুর আকর্ষণ বেশ উপভোগ্য। নিখিল বিষয়টিকে ততটা গুরুত্ব না দিলেও স্বভাবতই মনে মনে অপছন্দ করতো। আবার কিছুদিন পর কলকাতাতে অলোক ব্যানার্জির স্ত্রী মমতার সঙ্গে যখন নিখিলের পরিচয় হয় এবং একই গাড়িতে যেতে যেতে মমতার সঙ্গে নিখিলের গল্প জমে ওঠে, তখন অলোক ব্যানার্জি এক উদাসীন স্বামীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সে কিছুতেই ওদের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দিতে পারেনি, বরং গম্ভীরভাবে পথশোভা উপভোগ করার ছলে অন্যমনস্কভাবে সিগারেট টানতে লাগলো। কেননা সে এখন প্রেমিক নয়, স্বামী। হালকা রসিকতার মধ্য দিয়ে গল্প স্রোত প্রবাহিত হলেও মানব মনস্তত্ত্বের এক সহজাত প্রবৃত্তি লেখকের জীবন দর্শনের মধ্য দিয়ে আত্ম প্রকাশ করেছে। এই উপলব্ধিই গল্পটির বিশেষত্ব।

নর নারীর সম্পর্কের মাধুর্যই হচ্ছে প্রেম। এই মাধুর্যকে আত্মগত উপলব্ধি ও ব্যক্তিগত অনুভবের দৃষ্টিকোণ থেকে উচ্ছ্বসিত কল্পনার বর্ণময় মুহূর্তের সমন্বয়ে লেখক রচনা করে গেছেন অজস্র প্রেমের গল্প। লেখকের 'ভয়' গল্পটিতে প্রেমের এই মাধুর্য রামধনুর সাত রঙে রঙিন হয়ে প্রেমিক যুগলের চোখে ধরা দিয়েছে।

স্নিগ্ধা ও শান্তনু একে অপরকে ভালবাসে। কিন্তু স্নিগ্ধার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় এক মধ্যবিত্ত সংস্কারী মানসিকতা, যা রক্ষণশীল পরিবেশের বাধ্যতামূলক আবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে এসেও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, স্বাধীনতার অপব্যবহার সে করতে চায় না। তাই ভয় ও লজ্জার আবরণে নিজেকে আচ্ছাদিত রাখতে চায়। এছাড়াও তার মধ্যে কাজ করে আরও একটি ভয়। নিজেকে সে সুন্দরী ভাবে না, তাই তার ভয় তাকে বেশীক্ষণ দেখলে প্রেমিকের চোখে তার সেই রূপহীনতা যদি ধরা পড়ে যায়? সে জন্যই সে ক্ষণিকের বিদ্যুৎ প্রভা হয়ে প্রেমিকের কাছে ধরা দেয়। অথচ শান্তনুর কাছে স্নিগ্ধাই পৃথিবীর সেরা সুন্দরী। স্নিগ্ধার সাহচর্য তাকে নন্দন কানন ভ্রমণের সুখ এনে দেয়। সেই শান্তনুই আবার পাটনা থেকে ফেরার পথে হাজরার মোড়ে স্নিগ্ধাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেও তার সঙ্গে দেখা না করেই পালিয়ে এলো। সে ভেবেছিল ভ্রমণজনিত ক্লান্তির কারণে তাকে বেশ অগুছালো ও অসুন্দর দেখাচ্ছিল। তাই সেই অপ্রস্তুত চেহারায় সে প্রেমিকার আকর্ষণ হারানোর ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছিল। পরদিনই সে স্নিগ্ধার একখানা চিঠি পেল। চিঠিতে স্নিগ্ধা লিখেছে-

"জানো, কাল তোমাকে দেখলাম? নিজের চোখকে আমি বিশ্বাসই করতে পারি না। হঠাৎ মনে হল স্বর্গ থেকে দেবতারা আমার জন্য একটা পুরস্কার পাঠালেন। তুমি একটা কালো রঙের গাড়ি থেকে হাজরা মোড়ে নামলে। আমি হাত তুলে তোমাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তোমার বোধহয় খুব তাড়া ছিল, তুমি একটা মিনিবাসে উঠে পড়লে। তুমি আমায় দেখতে পাওনি, আমি কিন্তু তোমায় দেখে নিয়েছি। আমার ভাগ্যটা কত ভাল বল তো!

দাড়ি কামাওনি, মুখে নীল নীল দাড়ি, পাজামার ওপরে একটা লাল চেক চেক শার্ট পরেছিলে। তোমাকে কি ইয়াং আর কি সুন্দর দেখাচ্ছিল!"[১৮]

একেই বলে প্রেমের রামধনু, যা ভালবাসার সাত রঙে রঙিন হয়ে এক চির সুন্দর বর্ণময় রূপে প্রেমিকের চোখে ধরা দেয়। সামান্য হয়ে ওঠে অসামান্য, সাধারণ হয়ে ওঠে অসাধারণ। নিজের কাছে হয়ত বা অস্তিত্বের সংকট, কিন্তু ভালোবাসার মানুষটির কাছে ধরা দেয় বিধাতার আশীর্বাদ হয়ে। লেখকের এই আত্মগত উপলব্ধিকে প্রেমের মানস ভুবনে প্রেমিক প্রেমিকার এই রূপ মাধুরী পাঠক মনে এক অসীম পরিতৃপ্তির আস্বাদ এনে দেয়।

'ভূমি ও আকাশ' গল্পে অন্ধবিশ্বাস, সামাজিক কুসংস্কার ও সেই সঙ্গে দু'টি প্রেম পিপাসু হৃদয়ের একাত্মতার স্বর্গীয় অনুভূতি এক আবেগঘন মুহূর্তের মধ্য দিয়ে আত্ম প্রকাশ করেছে। বিধবা সরিতা গ্রামের এক বলিষ্ঠ যুবক ফাগুলালের প্রতি আকৃষ্ট থেকেও তার ডাকে সাড়া দেয়নি। কেননা এক অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সে নিজেকে পুরুষ প্রাণঘাতিনী বলে ভাবতে শুরু করে। সরিতার স্বামীর মৃত্যুর পর এক পন্ডিতজী তাকে বলেছিলেন সরিতার স্পর্শে নাকি পুরুষদের মৃত্যু ঘটবে।

গ্রামের খরাক্লিষ্ট মানুষ অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অনাবৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মালানদেব বা ইন্দ্রদেবতার পুজোর আয়োজন করে। সেই পুজোতে ইন্দ্রদেবতাকে তুষ্ট করার জন্য প্রচলিত কুসংস্কার অনুযায়ী বস্ত্রহীন সরিতাকে গভীররাতে একাকিনী কৃষি ভূমিতে পাঠানো হয় নৃত্যের মাধ্যমে ইন্দ্রদেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য। শেষ পর্যন্ত সকলের অলক্ষ্যে সরিতা ও ফাগুলালের মিলন হলো। ভালবাসার কাছে পরাজিত হল কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস।

সরিতা ও ফাগুলালের মিলনের মধ্য দিয়ে লেখকের জীবন দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক কুসংস্কারকে ছাপিয়ে মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও ভালবাসার এক জীবন্ত দলিল এই গল্পটি। লেখক নিজেও মধ্যবিত্ত পরিবারে বেড়ে উঠেছেন, পূর্ববঙ্গের মাইজপাড়া গ্রামে ছিল তাঁর শেকড়। তাই অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বাস্তব রূপ সম্পর্কে তিনি খুব অজ্ঞ ছিলেন না। কিন্তু জীবন রসিক লেখক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানব মন, তাদের অনুভূতি, আকাঙ্খা ও ভালবাসাকে অন্বেষণ করেছেন পরম মমতায়। সামাজিক অনুশাসন ও কুসংস্কারের খাঁচায় বন্দী মানব হৃদয়ের যন্ত্রণা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই কুসংস্কারের বেড়াজাল ডিঙিয়ে সরিতা ও ফাগুলালের মিলনের মধ্য দিয়ে প্রেমের চিরন্তন অনুভূতিকে মুক্তি দিলেন। তাঁর এই উপলব্ধি স্বকীয় মহিমায় অভিনবত্ব লাভ করেছে।

লেখক সুনীলের একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রেমের গল্প 'স্বর্ণলতা'। এই গল্পটিতে লেখক কলমের সূক্ষ্ম আঁচড়ে মনস্তত্ত্বের জটিল গলি পথগুলিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন। আপাত দৃষ্টিতে আমরা যা দেখি কিন্তু অনুভব করতে পারি না,এই গল্পটিতে লেখক সেই বিচিত্র জটিলতা আমাদের অনুভব করান। মনস্তত্ত্বকে অস্তিত্বের বহুবিধ বন্ধনের সঙ্গে মিশিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন ব্যক্তিত্বময়ী স্বর্ণলতা চরিত্রটিকে।

বাড়ির সকলের অমতে শুভব্রতকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল স্বর্ণলতা। কিন্তু বিয়ের মাত্র ক'বছরের মধ্যে এক ট্রেন দুর্ঘটনায় শুভব্রতর অকাল মৃত্যু ঘটে। তারপরও রূপসী যুবতী স্বর্ণলতা শ্বশুর বাড়িতেই থেকে গেল। শাশুড়ি মারা যাওয়ার পর শুভব্রতর ছোট ভাই প্রিয়ব্রতকে সে মাতৃস্নেহে বড় করেছে। আবার দেবর বৌদি দু'জনের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ও ছিল। ধীরে ধীরে প্রিয়ব্রত পূর্ণ বিকশিত যুবকে পরিণত হলো। হঠাৎ একদিন ঠাট্টাচ্ছলে স্বর্ণলতাকে ভয় দেখানোর জন্য প্রিয়ব্রত 'স্বর্ণ! স্বর্ণ' বলে ডেকে উঠতেই স্বর্ণলতা চমকে উঠে অজ্ঞান হয়ে সিঁড়ি থেকে পড়ে গেল। অসুস্থ স্বর্ণলতার পরিচর্যায় প্রিয়ব্রতর নিবিড় সান্নিধ্য শুভব্রতর স্মৃতিকে জাগরিত করে তোলে। সেই থেকেই স্বর্ণলতা ক্রমশ মনস্তত্ত্বিক জটিলতার চক্রব্যূহে আবর্তিত হতে থাকে।

মানব মন বড়ই বিচিত্র। কখন মনের কোন্ চোরাগলি পথে সুপ্ত বাসনার বিচিত্র পাহাড় মনকে অধিকার করে বসে, তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। অবদমিত অপ্রাপনীয়ের স্পৃহা হঠাৎ জীবনের কোনো এক মুহূর্তে জাগরিত হয়ে মনকে চঞ্চল করে তোলে এবং বাস্তবিকতা ও বিশ্বাসের মধ্যে এক কল্পবিশ্ব তৈরি করে নেয়। স্বর্ণলতাও স্বামীর মৃত্যুর বহু বছর পর হঠাৎ একদিন অতৃপ্ত প্রেমের দুর্বার আকর্ষণে নিজের অজ্ঞাতসারেই এক কল্পবিশ্বের রচনা করে, যেখানে সে প্রিয়ব্রতর মধ্যে খুঁজে নেয় শুভব্রতর প্রতিকল্প সত্তাকে। তাই প্রাণ পণে প্রিয়ব্রতকে নিজের কাছে আটকে রাখার চেষ্টা করেছে, তাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে।

স্বর্ণলতা প্রিয়ব্রতকে বিয়ে দিয়ে তার বউকে নিজের সঙ্গী করতে চেয়েছে, অথচ নীলিমা ও প্রিয়ব্রতর ঘনিষ্ঠতা সে সহ্য করতে পারেনি। কর্তব্যপরায়ণা, স্নেহময়ী স্বর্ণলতা বৈধব্য জীবনের সুদীর্ঘ বছর চারিত্রিক দৃঢ়তার সঙ্গে মানসিক প্রশান্তি বজায় রেখে সংসার ধর্ম পালন করে গেছে। কোথাও কোনো ছন্দপতন বা মনোবৈকল্যের সৃষ্টি হয়নি। অথচ হঠাৎ জীবনের কোনো এক সন্ধিক্ষণে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার পর স্বর্ণলতা নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তার মধ্যে এক ধরণের মানসিক বিকারগ্রস্ততা পরিলক্ষিত হয়। বাস্তব ও পরাবাস্তবের অন্তর্দ্বন্দ্বে স্বর্ণলতা প্রতিনিয়ত ক্ষত বিক্ষত হয়েছে।

গল্পের সুচারু বয়নে স্বর্ণলতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার লেখচিত্র লেখক সুনীলের এক সার্থক সৃষ্টি। এই গল্পে লেখক অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে মানব মনের বিচিত্র অনুভূতি, সম্পর্ক ও সংঘাতের নির্যাসকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। গল্পটির আবেদন পাঠককুলকে ভাববার এক নতুন পরিসর তৈরি করে দিয়েছে।

প্রেমের নানা বিচিত্র অভিব্যক্তি, অন্বেষণ ও সম্পর্কের নানা জটিলতা যেমন ব্যঞ্জিত হয়েছে কথাশিল্পীর বহু ছোটগল্পে, তেমনি পুরুষের চোখে নারীর রূপ ধরা দিয়েছে কিছু কিছু গল্পে। আসলে লেখক তরুণ বয়সে গৃহ শিক্ষকতার সুবাদে অনেক ধনী পরিবারের সুন্দরী মেয়েদের সংস্পর্শে এসেছেন। তাদের রূপ ও যৌবন তাঁকে মুগ্ধ করেছে বারবার।

'সার্থকতা' গল্পের বাসুদেব মজুমদার চরিত্রটিও এক সৌন্দর্য পিপাসু তরুণ যুবকের, যে প্রথম যৌবনে সাপ্তাহিক ঘরোয়া আড্ডায় সাক্ষাৎ হওয়া এক বিবাহিতা নারী অনামিকা দত্ত চৌধুরীর রূপ মুগ্ধ ছিল। অনামিকার রূপ, প্রাণ চাঞ্চল্য ও সরলতার সমন্বয়ে যে মাধুর্যের সৃষ্টি হয়েছিল, রূপ মুগ্ধ তরুণ বাসুদেব সেই ছোঁয়াটুকুই শুধু পেতে চেয়েছিল। চাওয়া পাওয়ার সীমানা ছাড়িয়ে শুধুই মুগ্ধতার অনুভূতি, এও এক ধরনের মুগ্ধ প্রেম। অনামিকাকে সে তার ব্যক্তিগত জীবনে কামনা করেনি, দূর থেকে দেখা তার রূপ মাধুর্যটুকুই তাকে তৃপ্ত করতো। দুঃখ এবং ব্যর্থতার মুহূর্তে অনামিকার সেই মাধুর্যময়ী মূর্তি তাকে মানসিক প্রশান্তি দিত।

বহু বছর পর সমাজে প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব মজুমদার বেশ কিছু মৌলিক যন্ত্রের মডেল আবিষ্কার করে যখন সার্থকতার শিখরে বিরাজমান, ঠিক সেই সময় আবার একদিন কলকাতার এক ঘরোয়া আড্ডায় অংশ নিয়ে অনামিকা দত্তচৌধুরীর সম্মুখীন হন। অনামিকা সেদিন নিজে থেকে এগিয়ে এসে আলাপ করার পরও বাসুদেব তাকে চিনতেই পারেননি। কিছুতেই মনে করতে পারছিলেন না, 'কে এই মহিলা'? জীবনের কর্মযজ্ঞে এগিয়ে যাওয়ার পথে কখন যে এই রূপ মুগ্ধতা ধীরে ধীরে তার মন থেকে অপসারিত হয়ে গেছে তিনি বুঝতেই পারেননি।

এই গল্পের বয়ান থেকে আমরা বুঝতে পারি রূপ তৃষ্ণা বা রূপের প্রতি মোহ মুগ্ধতা ক্ষণস্থায়ী। জীবনের কোন এক বিশেষ পর্যায়ে এসে এই ক্ষণস্থায়ী রূপ মুগ্ধতার কোন অস্তিত্বই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই সঙ্গে প্রেমের উপলব্ধি ও অনুভূতিও সবসময় অপরিবর্তনীয় থাকে না। পরিবেশ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী অনুভূতিরও পরিবর্তন হয়।

সর্বোপরি প্রেমের গল্প রচনায় কথা সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সার্থকতা অনস্বীকার্য। কেননা তিনি চিরনবীন, চির যুবক ও চির রোমান্টিক।

সুনীল প্রসঙ্গে গৌতম ঘোষদস্তিদার তাঁর 'অমরত্ব তাচ্ছিল্য করা এক প্রবল দৈত্যের কাহিনী প্রবন্ধে লিখেছেন-

"জুলফি পেকেছে তাঁর বহুকাল। লেখক জীবনও শেষ করল চার চারটে জলজ্যান্ত দশক। তবু সুনীল এখনও তরুণ পোশাকে, ব্যবহারে, মোঙ্গলিয়ন হাসিতে, রচনায়। তাঁর মহিলা ব্যূহ অতিক্রম করে আমরা প্রায়শই পৌঁছতে পারি না তাঁর কাছে! সুনীল, পঞ্চাশোর্ধ সুনীলকে, কেন এত ফুল দেবেন মেয়েরা! দেখে ঈর্ষায় খাক হয়ে যাই আমরা!"[১৯]

সুনীলের গল্পে মানব-মানবীর প্রেম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রক্তমাংসের দৈনন্দিনতায় চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের একথাও মেনে নিতে হবে যে,দেহকে অতিক্রম করে তার গল্প প্রায়শই দেহাতীত রহস্যময়তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। আর এখানেই গল্পকার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের শিল্পকুশলতা।

সূত্রনির্দেশ-

১. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'প্রেমের গল্প', মন্ডল বুক হাউস, কল-৯, আশ্বিন, ১৩৯০ সন, মুখবন্ধ

২. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'সুনীলের সেরা ১০১', পত্রভারতী, কল-৯, ডিসেম্বর ২০০৮, 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী', পৃঃ ১৮৯

৩. কোরাস, সৃষ্টি চিরন্তন, 'সুনীল আকাশে', দুঃখানন্দ মন্ডল, পশ্চিম মেদিনীপুর, পৃঃ ১৬৬

৪. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, ডিসেম্বর ২০১৭, 'মহাপৃথিবী', পৃঃ ৭০

৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৮

৬. 'সুনীলের সেরা ১০১', 'ত্রয়ী', পৃঃ ৬৮৫

৭. চট্টোপাধ্যায় শরৎ, 'শরৎ সাহিত্য সমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কল-৯, ৩১ ভাদ্র ১৩৯৩, শ্রীকান্ত ১ম পর্ব, পৃঃ ৩২৪

৮. চৌধুরী ভাস্কর, 'ছোটগল্পের অন্দর মহল', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কল-৯, মহালয়া ১৪১৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩২

৯. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'প্রেমের গল্প', মন্ডল বুক হাউস, কল-৯, আশ্বিন ১৩৯০, 'রাণী ও অবিনাশ', পৃঃ ৫২

১০. প্রাগুক্ত, 'মনীষার দুই প্রেমিক', পৃঃ ৫৪

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬০

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২

১৩. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'গল্প সমগ্র', মিত্র ও ঘোষ, কল-৭৩, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭, বঙ্গাব্দ, 'সিঁড়িতে', পৃঃ ২৬৪

১৪. প্রাগুক্ত, 'নদীর দু'তীর', পৃঃ ৩০০

১৫. 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', বাংলা ছোটগল্পের মূল্যান, সম্পাদক- সঞ্জীব কুমার বসু, বৈশাখ আশ্বিন ১৪০৬, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের শিল্পতত্ত্ব', মঞ্জুভাষ মিত্র, পৃঃ ৩৪২

১৬. কোরাস, 'সুনীল আকাশে', পৃঃ ১৬৭

১৭. চক্রবর্তী সুমিতা, 'ছোটগল্পের বিষয় আশয়', পুস্তক বিপণি, কল-৯, জুন, ২০০৪, পৃঃ ১৫০-১৫১

১৮. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'গল্প সমগ্র', 'ভয়', পৃঃ ৩৬৬

১৯. 'দৈত্য কাহিনী' আত্মপ্রকাশ, ৩১ মার্চ ১৯৯১ প্রকাশ- মুদ্রণ- ঊর্মিলা দাশগুপ্ত, অমরত্ব তাচ্ছিল্য করা এক প্রবল দৈত্যের কাহিনী, পৃঃ ১৩